যুগ-গুরু

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট.
কলিকাতা।

দেড় টাকা]

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস,
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অক্ষয় তৃতীয়া—১৩৩

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে ভারতে মায়াবাদীর মোক্ষের আদর্শ অপেক্ষা ধর্ম্ম-রাজ্যপ্রতিষ্ঠার এক অখণ্ড দিব্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই সাধনা ভারত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় করিয়াছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়াছে; ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সবই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে; ভীম আবর্ত্তে প্রাণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু তবু তার মৃত্যু নাই—বরং ইহাতে অসংখ্য সমস্যার গ্রন্থীমোচন হইয়াছে। পথের সন্ধান মিলিয়াছে—উৎসাহে, আনন্দে প্রাণে যৌবনের শক্তি অবতরণ করিয়াছে—জাতি ক্রমেই তেজোবীর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরের দিকে চাহিয়া কথাটা বুঝিতে চাহিলে, হাসির কথা বটে। কিন্তু জাতির অন্তরে অন্তরে ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় যে উৎসধারা ক্রমবিস্তৃত ও আপূর্য্যমান হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ করে, অন্তর্দৃষ্টি যাহার আছে সে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবে, পুলকে তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিবে।

আমরা বাহিরের দিকে পঙ্গু, মৃতকল্প। প্রাচীন পুরুষগণ বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির মুখে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া গিয়াছেন। যে প্রবৃত্তির উজ্জ্বল ফেনিল তরঙ্গ সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় দশদিক্ প্লাবিত করিয় ছুটে, সে প্রলয়ঙ্কর আড়ম্বর দুই চারি শত বৎসরের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ; ভারত তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে—সে চাহে নিত্য ভাগবত প্রবাহ বিশ্বের বুকে নামাইয়া আনিতে। অতি প্রাচীন এই জাতি জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই জানিয়াছে—এই পথে জীবনের স্থায়ী সম্পদ্ মিলে না, জীবন লক্ষ্যচ্যুত হয়; তাই অতি দীর্ঘ কাল সংযমের শক্ত বাঁধে আপনাকে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত ও অচল করিয়া রাখায় কিছুমাত্র সে কুণ্ঠা করে নাই। রুদ্ধ জীবন-স্রোতঃ চলকিয়া ফিন্‌কীর ন্যায় যে দুই একটা ধারা প্রকাশ হয়, উহা আটক থাকার দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টা, জীবনের সরল অভিব্যক্তি নহে। ভারতের প্রাণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। সে মন্দাকিনীধারা আজও ধরাকে অভিষিক্ত করে নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ জাতি প্রাচীন পুরুষগণের বিধিনিষেধ সসম্মানে মান্য করিয়া কোথাও কোথাও অতি সন্তর্পণে আপনাকে আলো বাতাসের রাজ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহাও ভারতের মূল প্রাণধারা নহে। কর্পূরের ন্যায় তাহা উপিয়া গিয়াছে, প্রাণের যোগান পায় নাই। ধূর্জ্জটীর জটাজাল ছিঁড়িয়া সে মাতঙ্গিনী কবে ধরাতল

প্লাবিত করিবে, সেই প্রতীক্ষায় আজ নিখিল মানবজাতি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

ভারতের প্রাণ আছে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিবার উপায় নাই। হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র উথলিয়া উঠে, কিন্তু প্রকাশের পথ নাই। শক্তি, জ্ঞান, প্রতিভা সীমাহীন; কিন্তু লীলায়ত নহে। রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করার চেষ্টা জাগিয়াছে; কিন্তু এ আগল বাহিরের আঘাতে অপসৃত হইবে না—এ কথা আজ কেহ শুনিতে চাহে না। কোলাহল উঠিয়াছে, জাতি আত্মদ্রোহী হইয়াছে, বিপ্লব দেখা দিয়াছে; ধৈর্য্যেরও সীমা আছে, ধৈর্য্যহীন জাতি পাষাণ-দুয়ার ভাঙ্গিতে চাহে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা। ভারতের প্রাণ ইহাতে জাগিবে না, প্রকাশ পাইবে না; চাই তপস্যা, চাই জাতির অন্তঃসাধনা।

বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। ভারতের অন্তরে যদি সত্য বস্তু থাকে, তবে তাহা নিগ্রহে নিঃশেষ হইবে কেমন করিয়া? উপরের চাপে ভিতরের প্রভাব পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া যে দিন প্রকাশের পথ চাহিবে, বাঁধনের প্রয়োজন সে দিন শেষ হইবে। অন্তরতম সত্তার বিজয়মূর্ত্তির সে আবির্ভাব-যুগ বর্ণনার নহে।

পাঁচ হাজার বৎসর জাতির জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ প্রাণের সলিতায় রক্ত-মজ্জা-মেদের তৈলসিঞ্চনে জ্বলিয়াছে; ইহারই অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিয়াছে, অনুভব করিয়াছে—আত্ম-চেতনার অমরত্ব। তাই আজ আর

তার অন্নে তৃপ্তি নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই ; ভূমার আনন্দে সে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে চায়—ইহার উদ্যোগ-পর্ব্ব অন্তরের মণিকোঠায় সুরু হইয়াছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। ভারত নূতন ঋকের সন্ধানে আত্মস্থ। উপাসনার মন্দির যে স্বর্ণচূড়া শিরে ধরিয়া কল্পে ফুটিয়া উঠে, তাহার সম্যক্ চিত্র চিত্তে সে আঁকিয়া লইতে সমাহিত। নূতন তপনের হিরণ্ময় দ্যুতিতে যে নূতন ভারতের সৌভাগ্য-যুগ—ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সব কিছুর যে অভিনব প্রকাশ, তাহা এখনও ধ্যান-দৃষ্টির সামগ্রী হইয়াই আছে ; এই ধ্যানকে মূর্ত্তি দেওয়াই সৃজনের তপস্যা।

ভারতের রাষ্ট্রকাহিনী অতীতের উত্থানপতনের জ্বলন্ত চিত্র—ইহার মূলে যে তপস্যার অগ্নিবীর্য্য ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত তাহা সহজে লক্ষ্যে পড়ে না। কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তিরচনায় ইহার মর্ম্মের পরিচয় হৃদয় দিয়াই অনুধাবন করিতে হয়। তদ্রূপ ভারত-ধর্ম্মেরও তো ইতিহাস আছে ; সে ইতিহাসে পাই—মানবজাতির অন্তঃসাধনার ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা। সে অন্তঃসাধনার সন্ধান কয় জন রাখে ?

ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় মস্তিষ্কবৃত্তির চর্চ্চা হয়, কিন্তু আত্ম-তত্ত্ব অন্তরসমুদ্র-মন্থনেই জাগিয়া উঠে। ধর্ম্মের ইতিহাস এই প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূলতা করে মাত্র। আজ জাগিতে হইবে আমাদের ভিতরের দিক্ হইতেই ; উপরে আঘাত দেওয়ার বিদ্রোহী মন অন্তরের সন্ধানহারা।

জাগিবার পথে এই সনাতন ধারা আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে।

সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মাবিষ্কারের সঙ্কেত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম উক্ত হইয়াছিল। তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—এই যোগ সৃষ্টির প্রথমে তিনি বিবস্বান্‌কে দিয়াছিলেন; তারপর পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতে আসিতে পথে কালবশে ইহা নষ্ট হইয়াছে। তাহাই তিনি পুনরুদ্ধার করিয়া স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের অমোঘ বীর্য্য সঞ্চার করিয়া যান। এই অমর ধর্ম্মপ্রভাব জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেই, এ জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের জাগরণ আত্মার মুক্তি ও দিব্য কর্ম্ম-সাধনের হেতু। অহঙ্কার পরিহার করিয়া জীবের চেতনা যে দিন ব্রহ্মচেতনায় যুক্ত হইবে, সেই দিন তার মুক্তি। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছাশক্তি আধারে আধারে লীলায়ত হইয়া উঠিবে। এই স্বর্ণ-যুগ আনয়ন করার প্রয়াস কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। সে অমর ভাবপ্রবাহ যুগে যুগে এই কল্পসৃষ্টি মর্ত্ত্যের বুকে ফলাইয়া তুলিতে কখনও মন্থর, কখনও উদ্দাম উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-হিল্লোলে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চিত কলুষ প্রক্ষালিত হইয়া ক্রমেই ইহা বিশুদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, রামানন্দ, রামদাস, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ—ভারতের

ধর্ম্মগুরুগণ ইহারই নিদর্শনস্বরূপ। এই মহাপুরুষগণের চরণস্পর্শে ভারতে ধর্ম্ম-সাধনার পথ ক্রমেই সরল ও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিতেছে।

এই ধর্ম্ম—সনাতন। স্থান, কাল, পাত্রভেদে ইহার অলৌকিক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ ইহা এক এবং অদ্বিতীয়। ধর্ম্মের মন্দিরে জাতি নাই, বর্ণ নাই, দেশগত পার্থক্য নাই। মানবজাতি যদি কোথাও অপ্রতিরোধী ঐক্যে ও প্রেমে একাত্ম সাধনায় অমর হয়, তবে তাহা এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতেই সম্ভব হইবে; ধর্ম্ম এই পবিত্রতম মহাতীর্থে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রসব করিবে।

ধর্ম্মপ্রাণ ভারত যুগে যুগে প্রবুদ্ধ হইয়া নির্ম্মম কালকবল হইতে স্ব-ভাব রক্ষা করিয়াছে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়াছে—অদ্বিতীয় ভগবানের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। কুরুক্ষেত্রের পর, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের আবিল তরঙ্গে জাতি যখন উৎসন্ন যাইবার পথে অগ্রসর, তখন সেই বিনাশের পথ হইতে জাতিকে অব্যর্থ তর্জ্জনী-সঙ্কেতে যিনি ফিরাইলেন, সমগ্র জগতে তাঁর বিজয়-স্মৃতি-পূজা সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। ইনিই ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তি। মহানির্ব্বাণের তোরণদ্বারে পৌঁছিয়া, মর্ত্ত্যের হাহাকারে করুণার ধারা ধরিয়া, চিরদিনের মত বিশ্বহিতব্রতে পৃথিবীর কল্যাণে তিনি আত্মদান করিলেন। বুদ্ধের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। ভাষা মূক, স্মরণে জীবের সমাধি হয়।

কালের সমুদ্র-মন্থনে আবার কালকূট হলাহল উঠিল। বুভুক্ষু অশেষ নাগের জৃম্ভনে করুণার মন্দার কলুষিত হইল। চতুর্দ্দিকে প্রমাদের হাহাকার, পাপের কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিল—ওঁ তৎ সৎ ওঁ। অমর ভারত-সত্তার মর্ম্ম নিঙড়াইয়া শঙ্কর-মূর্ত্তির আবির্ভাবে ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর অদ্বৈত বেদান্তের প্রণবধ্বনিতে মুখরিত হইল। আকাশে বাতাসে দিব্য স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও শক্তির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কত বলিব—যুগে যুগে ইন্দ্রজালের মত উন্নতশির অধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ভারতেরই নিত্য ঘটনা।

হিন্দু জাতির অধঃপতন-যুগে, ভারতের রাষ্ট্র লইয়া পাঠান মোগল তুর্কীর হস্তে ক্রীড়াকন্দুকের মত যখন লোফালুফি চলিতেছে, সেদিনও পঞ্চনদে নানকের কণ্ঠে সত্যের ঋক্ ঝঙ্কার দিয়া নবজাতি-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে। মহারাষ্ট্রে রামদাসের মন্ত্রে শিবাজী উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমে রামানন্দের তপস্যায় কবীর দাদু ধন্য হইয়াছেন। আর বাংলায় নবদ্বীপচন্দ্রের আলিঙ্গনে আচণ্ডাল স্থান পাইয়া বাঙ্গালীকে নবজীবনের আস্বাদ দিয়াছে।

তারপর, ভারতের শাসনদণ্ড প্রতীচ্য রাজশক্তির হস্তে অভিনব প্রথায় পরিচালিত হইল। কিন্তু জাতীয় প্রাণ-শক্তি শত আলোড়নে এখনও বিক্ষুব্ধ হয় নাই,

পল্লীতে পল্লীতে ভগবৎপরায়ণ সাধু সন্তের কণ্ঠে এখনও মধুর উপদেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়া জাতির ধর্ম্মপ্রাণ রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের অমৃতপরশ তাই এ জাতির মৃতসঞ্জীবনী।

সত্য ধর্ম্মের মর্ম্মাস্বাদে উৎসাহহীন হইয়া আমরা স্বার্থান্ধতা ও পরশ্রীকাতরতায় আপন-পর জ্ঞান হারাইয়াছি। অন্ধ চক্ষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া আত্মঘাতী। এ জাতির মুক্তির উপায়—বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। দৃঢ়ব্রতী ত্যাগী তপস্বী সন্তানের ঐক্যবদ্ধ জীবনের শক্ত ভিত্তির উপর ভর করিয়া সনাতন ভারতধর্ম্মের অগ্নিবাণী তাই আবার প্রচার করার দিন আসিয়াছে। এযুগেও হয়তো অসংখ্য খৃষ্টভক্ত সাধকদের মত যুগধর্ম্মীদের অত্যাচারীর হস্তে আত্মবলি দিতে হইবে, রামানুজভক্ত কুরিশ ও গোবিন্দের মত চক্ষু উৎপাটন ও জিহ্বা ছেদন করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে হইবে, শিখসন্তানের মত রুদ্ধশ্বাস হইয়া ভিত্তি-গাত্রে প্রোথিত হইতে হইবে, হরিদাসের মত প্রেমভক্তি বিলাইতে বাইশ বাজারে বেত খাইতে হইবে। যুগে যুগে যে সব অগ্নিহোত্রী সত্যের সন্তান বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে আত্মদানের ক্ষেত্রে আগমন করেন, তাঁহাদের আবির্ভাব আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতেছি। হিংসাদ্বেষশূন্য, স্বার্থলেশহীন বিশুদ্ধজীবন হে ভারতের দেবশিশু, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই তোমাদের আগমন। অসংখ্য সমস্যার

কুহেলিকায় উদ্ভ্রান্ত না হইয়া ভারতে ধর্ম্মসাধনার পবিত্র হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত কর। নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে অধ্যাত্ম তপস্যার বিপুল আয়োজনে উদ্যত হও। বিঘ্নে অন্তরায়ে, অত্যাচারে নির্য্যাতনে ধর্ম্মের মহিমাই উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রগুলি হইতে পঙ্গুত্ব ও সঙ্কীর্ণতা দোষ অপসারিত করিয়া উহাদিগকে জ্বলন্ত আত্মদানের তীর্থে পরিণত কর। উত্তরকালে যে দিব্য নির্ম্মাণের ভবিষ্যদ্বাণী পরিশ্রুত হইতেছে, অচিরে ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। চুঁচিয়া চুঁচিয়া হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়াই. সৃষ্টির বনীয়াদ গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। আজ সিদ্ধ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব বিভূতি-প্রদর্শনের যুগ এ নয়; দধীচির মত অস্থিদানের সামর্থ্য লইয়া কে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অগ্রসর হও। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজের জাতি! ভারত ধর্ম্মপ্রাণ, এই বিশ্বাস জীবন দিয়া প্রমাণ কর, সার্থক কর— প্রাণ, মন, হৃদয় ঢালিয়া ধর্ম্মের বিজয়শ্রী ফুটাইয়া তোল।

মনে রাখিও—ধর্ম্ম তীক্ষ্ণ তরবারির অপেক্ষা ক্ষুরধার। মনে রাখিও—কোটী সূর্য্যের উত্তাপ অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতাপ জ্বালাময়। মনে রাখিও—ধর্ম্ম সখের পুতুল নয়, যে জড়-দেহের সুচিক্কণ কাচের আলমারীতে সাজাইয়া তৃপ্তি পাইবে। ধর্ম্মকে আশ্রয় দিতে হইলে, চাই তোমার নব জন্ম, নূতন দেহ, নূতন প্রাণ। ধর্ম্মের আশ্রয়ে জীবনের কুটীর বিলাসের পঙ্কে গড়া সম্ভব নয়; ত্যাগের অগ্নিপ্রাচীরে উহা ঘেরা। কেবল স্বীকার কর—ধর্ম্মজীবনের

ভিত্তির উপর তুমি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবে; আর কিছু করিতে হইবে না। এই স্বীকৃতিটুকু কিন্তু জীবনপণে করিও—ভারতে অধর্ম্মের উচ্ছেদ ও ধর্ম্মসংস্থাপন তোমার দ্বারাই সম্ভব হইবে। জাতির এই ভবিষ্যন্নির্দ্দেশ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যে ফুংকারে ফুৎকারে ফুকারিয়া গিয়াছে; নান্নুরে, নবদ্বীপে, দক্ষিণেশ্বরে যুগশঙ্খ এই বাণীর তুমুল প্রতিধ্বনিই তুলিয়াছে। কত শঙ্কর, কত বুদ্ধ, কত ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। যে কল্পবৃক্ষের মূল ভারতের বুকে স্থান পাইয়াছে, তাহার অমৃত ফলের আস্বাদে যতদিন না ধরাবাসী ধন্য হয়, ততদিন ভারতের মিশন, তাহার বিধাতৃদত্ত জন্মাধিকার লুপ্ত হইবে না।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

*   *
*

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপনের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যে পঞ্চপাণ্ডবের সহায়তায় ভারতে নবরাজ্য-গঠনের আয়োজন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেই পঞ্চপাণ্ডবের শিরোমণি যুধিষ্ঠির শোককাতর হইয়া পড়িলেন; হইবারই কথা। ভারতের আকাশমণ্ডলে সে দিন পতিপুত্রহীনা রমণীগণের যে শোকার্ত্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, তাহা মর্ম্মভেদী; মানুষের অন্তর সে নিদারুণ আঘাত সহিয়া স্থির থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাণী যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ নিবারণ করিল না, তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; দেখিলেন—রণক্লান্ত যাদবগণ অবসাদাচ্ছন্ন হইয়া উন্মার্গ-গামী হইয়াছে। তিনি বিপ্র-শাপচ্ছলে মুষল দ্বারা স্ববংশের ধ্বংস করিয়া প্রভাস-তীর্থে স্বীয় কলেবর বিসর্জ্জন দিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন।

ভারতের আকাশ মসীবর্ণ হইল, ভারতের গৌরব-সূর্য্য দীর্ঘ দিনের জন্য ডুব পাড়িল।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভারতের দুরবস্থা ঐতিহাসিকের মতে আজ কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসরের অধিককাল অনাহত স্রোতে চলিয়াছে। এই পাঁচ হাজার বৎসরের অন্ধকার অপসারিত করিয়া ভারতের ভবিষ্যন্নির্ণয় অল্প তপস্যায় সংসিদ্ধ হইবে না। তাই তরুণ জাতির নিরন্তর তপস্যাপ্রবাহ অনাহত রাখার উদ্যোগ চিরযুগ ধরিয়া

চলিয়াছে ; মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, রামানন্দ, রামদাস, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ একই প্রবাহের তরঙ্গহিল্লোল, একই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও পালনের মূর্ত্তিমান্ মন্ত্রচ্ছন্দ।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম জীবনের উপর প্রতিষ্ঠা পাইতে চাহিয়াছিল—জীবনের অতীত হইয়া নহে ; কিন্তু নশ্বরতার মোহ অমর জীবনস্রোতঃ বাহ্যতঃ অস্থায়ী বোধে ধর্ম্মকেই জীবনের ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ধরিল, ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনকে সমুচ্চে উঠাইল না—অনাশ্রয়ে ধর্ম্ম তুরীয় হইয়াই রহিল, জীবনে আর প্রতিষ্ঠা পাইল না। ধর্ম্মরাজ্যরচনার মানুষ-গড়ার আয়োজন এই পাঁচ হাজার বৎসর একপ্রকার বন্ধ হইয়াই আছে। তত্ত্বাবিষ্কারেই আত্মবলি পড়িয়াছে, তত্ত্ব মূর্ত্ত হইয়া ধরাকে স্বর্গে পরিণত করে নাই—অতীতের ইতিহাস ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জীবনের উপর আঘাত দিয়াই প্রকৃতি উপনিষদের ধর্ম্ম জগতে স্থায়ী হইতে দেয় নাই। ভারতের ভবিষ্য-পুরুষগণ যেন স্মরণ রাখেন—মায়াবাদ জীবনের ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মে ও জীবনে সামঞ্জস্যবিধানের প্রথম প্রয়াস উপনিষৎ-প্রণেতৃগণই করিয়াছিলেন ; গীতায় ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন। উপনিষদে আছে আদর্শ ; গীতা আদর্শপালনের উপযোগী চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা দিয়াছে। সে চরিত্র ভাগবত চরিত্র। সে দিব্য চরিত্রের

মানুষ ভগবানের মানুষ। অর্জ্জুনকে এইরূপ ভাবেই ভগবান গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

সে গড়ার আয়োজন সে দিন ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু সে অমর আয়াস আজও নিঃশেষ হয় নাই। ভগবানের পাঞ্চজন্য আজও অনাহত ধ্বনি তুলিয়া ভগবানের মানুষ গড়ার মন্ত্র প্রচার করিতেছে। ইহা এক যুগের কাজ নয়, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিবে কে বলিবে! ভারতের ধর্ম্ম দেশকালগত নহে, সনাতন—বিশ্বমানবের মুক্তি-মোক্ষের নিদান। এই ধর্ম্ম-সংগঠনের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু নির্ম্মাণ-নীতির এই নিগূঢ় রহস্য অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তাই ইহার বিস্তৃত প্রবাহ সৃষ্ট হইতেছে না। আমরা ভারতের মর্ম্ম-সত্য যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, ইহার সত্যও উপলব্ধি করিতে পারিব এবং দিব্য জীবনের পথে অগ্রসর হইব। অর্জ্জুনের অপেক্ষা আরও শক্ত, আরও নির্ম্মম মানুষের প্রয়োজন। এইরূপ অসংখ্য মানব-সমষ্টিই ভবিষ্য-ভারতের জীবন্ত মূর্ত্তি; আর এইরূপ জাতিগঠনের ডাকই ভারতে সাড়া তুলিয়াছে—কে একথা বুঝিবে?

শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম-জীবনের প্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্পে মহা কুরুক্ষেত্র সৃজন করিলেন, তাহার সাফল্যের অভাবে দারুণ প্রতিক্রিয়ায় ভারত অবসন্ন হইল। তিনি শোক-দুঃখের অতীত হইয়া, জয়-পরাজয়ে অক্ষুণ্ণ হৃদয় লইয়া, জীবনে

ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাঁর অন্তর্দ্ধানে সে তেজঃ, সে তপস্যা ম্লান হইল। কুরুক্ষেত্রের শ্মশান-দৃশ্য ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তরতম সত্তায় আজও বোধহয় শ্মশান-বৈরাগ্যের হুতাশন প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে। গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের আশ্রয় হইতে আভীর দস্যু যে দিন মাত্র লগুড়ের সাহায্যে যাদবপত্নীদের অপহরণ করিল, অর্জ্জুন সেদিন নিদারুণ ক্ষোভে কাতর হইয়া হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের নিকটে সেই মর্ম্মান্তিক সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া দিলেন— সেইদিন ভারতের উন্নতিমুখী জীবনস্রোতঃ অনিত্য-বোধে উপেক্ষিত হইয়া ধর্ম্মসাধনার অস্থায়ী আশ্রয়-রূপে পরিগণিত হইল। ভারতের জীবন সেই দিন হইতে নশ্বরবোধে অনাদরে, অনাস্থায় হেয়, শৃগাল কুক্কুরের আহার্য্যস্বরূপ বৃথা ভারবহনের অর্থহীন ক্লেশ বলিয়া গণ্য হইল। ভারতের জীবন-প্রদীপ নিভিল, আর জ্বলিল না ; ভারত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল।

কুরুক্ষেত্র-যুগের পরবর্ত্তী ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এই শ্মশান-বৈরাগ্যের মর্ম্মস্পর্শী হাহাকারই শুনা যায়। অনিত্য জীবনের উপর অনাস্থা সৃজন করিয়া মোক্ষ বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এইরূপ বাণীই যুগগুরুগণের কণ্ঠে নানা ছন্দে ঝঙ্কার দিয়াছে ; ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যে ধর্ম্মে ভারতের কোটী কোটী

নরনারী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অপার্থিব আনন্দে বিভোর হইয়াছে, সে ধর্ম্মের প্রভাব ও মহিমা অনির্ব্বচনীয়। আমরা এই ত্যাগধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাই এইবার বর্ণনা করিব।

*   *
*

মহাবীর

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আর এক মহাপুরুষ ভারতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ও মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের যুক্তিতর্কের ক্ষুরধারে সে ধর্ম্ম হীনবল হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ধারাবাহিক যে ধর্ম্মস্রোতঃ ভারতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা জৈনধর্ম্ম। জৈনমতের আদি প্রবর্ত্তক ঋষভদেব; কিন্তু পার্শ্বনাথ ইহা স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের পর মহাবীরই এই ধর্ম্মের বিজয়-স্তম্ভ। পার্শ্বনাথ ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার ২৫০ শত বৎসর পরে, ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্বে ২৩ জন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয়, গীতাধর্ম্ম-প্রচারের পর ভারতে জৈনধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মহাবীর যখন ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হন, কথিত আছে—তাঁহার সঙ্গে ১৪০০০



মহাবীর

হাজার সাধু, ৩৬০০০ সাধ্বী, ১৪ পণ্ডিত, ১০০ শ্রমণ, ১৩০০ শত অবাধ-জ্ঞানী (ধারাবাহিক জ্ঞানরক্ষাকারীকে অবাধ-জ্ঞানী বলে), ৭০০ শত কেবলী, ৫০০ শত মনোবিৎ, ৪০০ বাদী, ১৩৯০০০ শ্রাবক, ইহার দ্বিগুণ শ্রাবিকা এবং গৌতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গুণধর সঙ্গে থাকিত। ইহা হইতেই মহাবীরের প্রভাব ভারতে কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাক্যসিংহের মত মহাবীরও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদি-নাম বর্দ্ধমান; কিন্তু মানুষের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তৃত হইলে ইনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাবীর রাজকন্যা যশোদার পাণিগ্রহণ করেন। প্রিয়দর্শনা নামে তাঁর এক কন্যা হয়; কুমার জামলি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দুই বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হন; তারপর ছয় বৎসর কঠোর যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিদ্ধার্থ নামক এক যক্ষের অনুগ্রহে মহাবীরের বুদ্ধিবৃত্তি অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করে। এই দিব্য প্রতিভাবলেই তিনি নিগ্রন্থ বা জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্মে আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এই দুইটী অস্বীকার করেন; এইজন্য জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ের ত্যাগ সমতুল্য। বুদ্ধদেবের মতই মহাবীরও জগতের অনিত্যতাদর্শনে সংসারভোগে বীতরাগ হইয়া রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে, লজ্জাই পাপ; এইজন্য পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। জৈনধর্ম্মে এখনও দুই দল আছে—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর।

পার্শ্বনাথের শিষ্যগণ শ্বেতাম্বর; মহাবীরের শিষ্যগণ দিগম্বর। ইহাদের মধ্যে বিবাদ চলিত। মহাবীর যখন সশিষ্য ৬ বৎসর মগধ ও অযোধ্যায় ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হন, তখন বজ্রভূমি, সুহ্মভূমি ও লাড়দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করে; তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। কৌশাম্বীর রাজা শতানীক তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। মহাবীর দ্বাদশ বর্ষ উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা করেন, অবশেষে বৈশাখ মাসে ঋজুপালিকা নদীতীরে শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে কেবলী-জ্ঞান লাভ করেন। ইহাই জৈনধর্ম্মের চরম সীমা। আকাশ হইতে দেবগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন—"সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অন্তগতে পরিনিব্বুত্তদসর্ব্ব-

দুঃখপহিণে”—সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিলেন, অপাপ-পুরীতে গিয়া মোক্ষ-বিষয়ে মধুবর্ষী উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁর বাণী শুনিতে বনের পশুও সমাগত হইত। দীন দুঃখী, রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই তাঁর চরণে মাথা নত করিল। মহাবীরের পূজা ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল। মগধের বহু ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে জৈনধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্ম হইল। মহাবীরের শিষ্য ভদ্রবাহুর নিকট মৌর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত দীক্ষা লইয়াছিলেন। বিশ্রুতকীর্ত্তি রাজা অশোকও জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ; পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। জৈনধর্ম্ম একদিন ভারতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়াছিল এবং মহাবীর এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইলেও, এই মহাপুরুষের জীবন-বেদের উপরেই বর্ত্তমান জৈনধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

উপসংহারে সংক্ষেপে জিন-ধর্ম্মের কয়েকটী তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। জিনই এই ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা। বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন, নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা—মনুষ্য-সংক্রান্ত এই দোষগুলি যাঁহার নাই, তিনিই জিন হইতে পারেন। মহাবীরের পর আর কেহ জিন আখ্যা লাভ করেন নাই।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই উভয় প্রমাণসম্মত তত্ত্ব জৈনগণ স্বীকার করেন। জগতের তত্ত্বনির্দ্ধারণে জৈনদের মতে মূল তত্ত্ব ৯টী, মতান্তরে ৭টী। ঐগুলি আবার নিত্যানিত্য মিশ্রিত; যথা—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব (যাহা কর্ম্মবন্ধন সৃজন করে), সম্বর, বন্ধ, নির্জ্জর ও মুক্তি। সপ্ত-তত্ত্ববাদিগণের মতে মুক্তি নির্জরের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত।

জৈনধর্ম্মী সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, ভিক্ষান্ন-'ভোজী; তাঁহারা কদাচ কেশ-সংস্কার করেন। যাঁহারা দিগম্বর তাঁহারা পিচ্ছিকা-পয়ঃ-পাত্রধারী, নিরাবরণ। শ্বেতাম্বর যাঁহারা, তাঁহারা সম্ভোগবিরত; দিগম্বরদের ইহাতে বাধা নাই।

জৈনধর্ম্মের মতে সর্ব্বজ্ঞ আত্মাই ঈশ্বর। জীব সংসারী ও মুক্ত, এই দুইভাগে বিভক্ত। সংসারীর মধ্যে আবার সমনস্ক ও অমনস্ক আছে। যাহারা শিক্ষাক্রিয়া-কলাপাদি অভ্যাসে রত, তাহারা সমনস্ক; তদ্ব্যতিরিক্ত অমনস্ক। অমনস্ক আবার এস ও স্থবির, এই দুই ভাগে বিভক্ত; এস—শঙ্খ, গণ্ডলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ও ত্রি-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব; পৃথিবী, জল, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে গুরুমুখী হইতে হয়; শাস্ত্রচর্চ্চা ও জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়।

জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন করিলে মুক্তিলাভ হয়। যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণ অজ্ঞান ও কর্ম্মবন্ধন বর্ত্তমান থাকে; তাই জিনেরা কর্ম্মবন্ধন শেষ হইলে দেহত্যাগ করেন—জীবনের ইচ্ছা থাকিতে কেহ এই পথে অগ্রসর হন না। বাসনা-ক্ষয়ে ধীরে ধীরে দেহনাশে মুক্তিলাভ হয়। দেহনাশের উপায়—প্রথম দুগ্ধ ও অন্ন গ্রহণ করা, পরে দুগ্ধ অথবা অন্ন ত্যাগ করা; ধীরে ধীরে আহার অল্প করিতে হয়, পরে শুধু পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জলপান—এইরূপে সাধক দেহমুক্ত হইয়া আত্মায় উদ্গমন করেন।

জৈনদের পূজার মন্ত্র—"ওঁম্ শ্রীং ঋষভয়ে স্বস্তি, ওঁম্ হ্রীংহম্, ওঁ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যোনমঃ, ওঁদ্রীংদ্রীম্ সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যো নমঃ।" ইহাদের গায়ত্রী—"নমো অরীহন্তানং নমো সিদ্ধানং নমো আয়রীয়ানাং নমো উজহ্যয়ানং নমো লৌহসর্ব্বসাহণং।"

জৈনধর্ম্মের যতিগণ তত্ত্ব বিচার করেন না। তাঁহারা সার বুঝিয়াছেন—"ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ" "সর্ব্ব সুখানাং প্রধানহেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যে"; "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ"—স্বর্গ ও অপবর্গ ধর্ম্মের ফল, আর "সাধূনাং আচারঃ", মানুষের উৎকর্ষ-লাভ সাধুর আচরণে। অষ্টম তপস্যার সাধনে তাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন থাকেন। চৈত্য-স্থানে পাঠ, সাধু-বন্দনা, প্রতি বৎসরে একবার তীর্থ-ভ্রমণ, মিত্রভাবে অবস্থান, ইন্দ্রিয়-দমন—এই

পাঁচটী অষ্টম তপস্যা নামে অভিহিত। যতিগণ একনিষ্ঠ চিত্তে ইহারই সাধনা করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত জৈনধর্ম্মেও অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। জৈনধর্ম্মের সার নীতি "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যে" এইরূপ আছে ঃ—

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্ম সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্ত্বানাং বিধেহ্ প্রকৃতিং তথা ॥
তদ্বৈরিণ্যপি মা বৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায় চ ॥
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুর্মুক্তপরিগ্রহঃ।
দয়াপ্রধানো ধর্ম্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তু মে ॥"

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-কোষকার হেমচন্দ্র ও অমরসিংহ জৈনধর্ম্মী ছিলেন। অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসৎ ছিলেন। ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কথা। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। মহাবীরের অন্তর্দ্ধানের ১৬৬৯ বৎসর পরে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ধনকুবের জগৎশেঠ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; এক্ষণে ইঁহার বংশধরেরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। জৈন-ধর্ম্মের অসাধারণ সাধনার মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী উদয়নাচার্য্য বলিয়াছিলেন ঃ—

"যস্ত্বসাধারণো মুখমণ্ডলীকরণাদি কেশোল্লুঞ্চনাদিশ্চ-নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।" অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকা-

গ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী অসাধারণ অনুষ্ঠান জৈনদিগের মধ্যেই আছে, অন্য কোন জাতির নাই।

ভারতের সত্তায় যে ত্যাগ ও তপস্যার বিদ্যুচ্ছশক্তি সঞ্চিত হইয়া ভারত জগদ্বরেণ্য হওয়ার অধিকার লাভে আজ অগ্রসর, তাহার মূলে জৈনধর্ম্মের অপার্থিব দান জাতি অস্বীকার করিতে পারে না। আমরা যতি-ধর্ম্মের আদি-গুরুগণের চরণে ভূয়সী প্রণাম করি।

* * *

বুদ্ধ

কালের আবর্ত্তনে, ভারতের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভঙ্গী যথেষ্টই পরিবর্ত্তিত হইল। দেবতার উপাসনা-মন্দিরে ভারতবাসীর কণ্ঠে অন্তর্য্যামীর আরাধনা-সঙ্গীত নব নব ঋক্-মন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিল। জাতি-ভেদ ও বর্ণ-ভেদ তখনও আজিকার মত এমন শোচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই; কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের বিবর্ত্তন-সূত্রে ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রভাব অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইল। ধর্ম্মে ও রাজকীয় কর্ম্মে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য অতিশয় প্রাধান্য বিস্তার করিল। যে ধর্ম্মসাধনার উপাসনা-ক্ষেত্রে সর্ব্ব বর্ণ ও জাতি সমবেত হইয়া বেদ-মন্ত্রে আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনি তুলিত, তাহা ক্রমেই ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পদে পরিণত হইল, তপস্যার কঠোর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ঈশ্বরের সাধনা কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের সাধ্য-রূপেই পরিগণিত হইল। অন্যান্য জাতি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণের শরণাগত হইত। জ্ঞানমূলক অধ্যাত্ম অনুভূতির সাধনা কর্ম্ম-রূপে দেখা



বুদ্ধদেব

দিল। অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি বিস্ময়কর ও কৌতূহলপ্রদ বিচিত্র ধর্ম্মকার্য্য-সাধনে ব্রাহ্মণেরা কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। সমাজে বৈষম্য দেখা দিল। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে নানাবিধ শাস্ত্র-রচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনু, পরাশর প্রভৃতির মত স্মৃতির বাঁধনে জাতিকে অষ্টপাশবদ্ধ করার আয়োজন চলিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য গুণভেদে না হইয়া অবস্থাভেদে মানুষের উন্নতিপথ রোধ করিল। এই ব্রহ্মণ্যশক্তির :উৎকট প্রতাপের যুগে, নেপাল-রাজ্যের সীমান্তে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। ইনিই ভারতে এই অস্বাভাবিক ব্রহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মে ও সমাজে ভেদ-নীতির মূলোচ্ছেদ করিয়া সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবিকৃত ভাবে ভারতে যদিও স্থায়ী হয় নাই তাহা হইলেও এই সাম্য-প্রয়াস সমাজের ভিত্তি-মূলে যে অলক্ষ্য প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে তাহা সামান্য নহে।

সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজভোগে জীবন অতিবাহন করেন। ১৯ বৎসর বয়সে কোলকন্যা যশোধরার সহিত তাঁর পরিণয় হয়। এই অশেষ ভোগের মধ্যে তাঁর চিত্ত একদিনের জন্যও অভিভূত হয় নাই। তিনি ভাবিতেন —সংসার প্রবাস, একপ্রকার কারাগার; মিয়াদ ফুরাইলে

নিজধামে প্রস্থান করিবেন। এইরূপ মনোভাব থাকায় তিনি সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন থাকিতেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই ঔদাসীন্য দূর করার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তিনি আবদ্ধ হইলেন না। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-রাত্রিতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলেন। প্রাবৃটের ম্লান জ্যোৎস্না ধরাকে ঘিরিয়া সেদিন অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল।

দয়ার অবতার ভগবান বুদ্ধ মানবের ক্লেশ অপনোদন করিবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যৌবনে জীবের প্রতি যে অকৃত্রিম মমতায় কাতর হইয়া বাণবিদ্ধ হংসকে বুকে তুলিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাণীমাত্রের জীবনযন্ত্রণায় কাতর হইয়া বুদ্ধ নিত্যকালের জন্য ধরায় বাঁধা পড়িলেন। তপঃসিদ্ধ হইয়া মহানির্ব্বাণলাভের সন্ধিক্ষণে মর্ত্ত্যের আর্ত্তনাদ তাঁর কর্ণে গিয়া পৌঁছিলে, তিনি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কিসের কোলাহল!" তিনি উত্তর দিলেন—"বুদ্ধ আজ মুক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিশ্বের চক্ষে ব্যথার অশ্রুই এখনও ঝরিতেছে—ইহা ব্যথিতের আর্ত্তনাদ।" বুদ্ধ ফিরিলেন, শপথ করিলেন—'কীট পতঙ্গের মুক্তি না হইলে আমি নির্ব্বাণ চাহিব না।' কি নির্ব্বাণকামী, কি মায়াবাদী, ভারতের ত্যাগবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত অগ্নিমূর্ত্তি সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে, আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা

ছাড়িয়া বিশ্বের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন—তাই পৃথিবী আজ এত মহীয়সী!

বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন—বাল্য নিত্য নয়, যৌবন নিত্য নয়; এই দেহ স্থাবর, জড়বৎ, বার্দ্ধক্যের কষাঘাতে ক্লান্ত বিশীর্ণ হয়—পরিবর্ত্তনশীল দেহের অহং-ত্যাগেই ঐ দায় হইতে মুক্তি। তিনি দেখিয়াছিলেন—যৌবনেও জরার আক্রমণ, শরীরে ব্যাধির আধিপত্য, অবস্থার পীড়ন; মায়ারজ্জুর ছেদন, ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। আর তিনি দেখিয়াছিলেন—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান, যশঃ, স্ত্রী, আধিপত্য নিত্য নয়। মরণ নিবারণ করা যায় না; সে যখন খুসী আসিয়া মানুষের সোণার স্বপ্ন চূর্ণ করিয়া দিবে। বৈরাগ্যের আগুন বুকে জ্বলিল। ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর সৌম্য পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—মুক্তির এই পথ। ধ্যানে বসিয়া তিনি ইহাই স্থির করিলেন। সঙ্কল্প অটুট করিয়া যেমনি তিনি আসন হইতে উঠিবেন, শুনিলেন—পুত্রধন রাহুলের জন্ম-সংবাদ। কে যেন বক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিল। গভীর রাত্রে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দীপাধারে তখনও সুগন্ধি তৈল নিঃশেষ হয় নাই—ধিকি ধিকি অসংখ্য আলোকমালায় রাজপুরী উজ্জ্বল, উৎসবময়, সুরভি কুন্তলের গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নর্ত্তকী-কুলের তন্দ্রাতুর কণ্ঠে প্রেমের রাগিণী শিহরিয়া গুঞ্জন তুলিতেছে। তিনি উঁকি মারিয়া দেখিলেন—ঘর আলো

করিয়া যশোধরার স্বর্ণাঞ্চলে বংশের দুলাল নিকষিত হেমমূর্ত্তি ; আর যশোধরা—অভিন্নহৃদয়ের শতদল শ্রান্ত-মলিনবদনা, শ্রান্তিঘোরে বিনিদ্র আঁখি, ভ্রু-যুগলে ভ্রমরার শ্রেণী, একটী শেষ চুম্বনের আকুলতায় জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিয়া উঠে ! কিন্তু না, অন্তর্য্যামীর বজ্রকণ্ঠ নিষেধ করিল—নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া চাই। এই প্রেম বিশ্বের মুক্তি দিতে আজ বিরাট্ বেশে দেখা দিয়াছে। ঘুমাও গোপা ! যশোধরার আদরের নাম বুদ্ধের কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরেই একবার মাত্র ফুটিয়া উঠিল। বুক যেন ছিঁড়িয়া যায় ! কিন্তু নিরুপায় সিদ্ধার্থ ! আষাঢ়ের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোতিঃহীন—বুদ্ধ প্রিয় অশ্ব কণ্ঠকের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ছন্দক আসিয়া বলিল—"প্রভু !" বুদ্ধ ঘোড়া হাঁকাইয়া দিলেন, ছন্দক তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইল।

ছন্দক অর্দ্ধপথে বুদ্ধের আদেশে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজবাটী প্রত্যাগমন করিল। অন্তঃপুরবাসীর কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সাধের গোপা সন্তানের মুখ চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল। কপিলাবস্তুর পশুপক্ষী কাঁদিয়া আকুল হইল।

তাৎকালীন প্রথানুযায়ী শাক্যসিংহকেও গুরুগৃহে গিয়া ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। দিব্য জ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে

পঞ্চতপার মত কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা ব্যতীত যে ইহা সিদ্ধ হয় না, এ ধারণাও তাঁর বদ্ধমূল ছিল। এইজন্য প্রথম বৈরাগ্য-সঞ্চারে তিনি দুইজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যার্জ্জনের যে সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও প্রথমে উপবাসাদি নানা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম্মানুরাগের ঐকান্তিকতায় ও অমানুষিক তপোনিষ্ঠায় অচিরকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে যশঃ-সৌরভ ছড়াইয়া পড়িল। বুদ্ধ স্বয়ং কিন্তু তখনও সত্যের সাক্ষাৎ পান নাই। সেই সময়ে তাঁর পাঁচজন শিষ্য সঙ্গে ছিল। তাহারা যখন গৌতম বুদ্ধকে রুদ্ধশ্বাসে একাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিল, আহার বন্ধ করিয়া বায়ু-ভক্ষণে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লক্ষ্য করিল, তখন ভাবিল—সিদ্ধার্থ সিদ্ধ হইয়াছেন। তাহারাই বুদ্ধের প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। নগর ও গ্রাম হইতে মহাপুরুষ-দর্শনে মেলা বসিতে আরম্ভ করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া অরণ্যপ্রান্তবাহী নদী-তীরে ধীরপদে পদচারণা করিতে লাগিলেন। শরীর অবসন্ন, চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন, দুর্ব্বল পদদ্বয় দেহভার বহন করিল না। মাথা ঘুরিয়া তিনি হতচেতন হইলেন। শিষ্যবর্গের যত্নে জ্ঞানসঞ্চার হইলে, তিনি আদেশ করিলেন—গ্রাম হইতে খাদ্যাদি লইয়া আইস, অনাহারে তত্ত্বের সন্ধান মিলে না। অধ্যাত্ম অনুশীলন সুস্থ শরীর ও মস্তিষ্কের দ্বারাই হয়, কৃচ্ছ্রতায় হয় না। শিষ্যগণ

বিস্মিত হইল; শাক্যসিংহকে যোগভ্রষ্ট ভাবিয়া তাহারা পরিত্যাগ করিল। তিনি গভীর অরণ্যে ধীর চরণে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরের দয়া মূর্ত্তিমতী বেশে তাঁহার সম্মুখে উদিত হইল। সুজাতা নামে এক গোপ-কন্যা উত্তম পায়সান্ন হস্তে লইয়া মহাপুরুষের চরণে মাথা নত করিয়া বলিল, "প্রভো! শত গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া এই পরমান্ন রন্ধন করিয়াছি। বন-দেবতার উদ্দেশ্যে ইহা উৎসর্গ করিব—আমি যেন পুত্রবতী হই!" উপবাসশীর্ণ তপস্বী শাক্যসিংহের ভাস্বর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, গোপকন্যা ইঁহাকেই বন-দেবতা বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। বুদ্ধদেব রমণীর হস্ত হইতে পরমান্ন লইয়া ভোজন করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বাছা, তুমি পুত্রবতী হও।" বুদ্ধের ক্লান্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলিল; তিনি সন্নিকটবর্ত্তী বোধি-বৃক্ষমূলে আসন করিয়া বসিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

—এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক্; ত্বক্, অস্থি, মাংস প্রলয়ে ডুবিয়া যাক্—দুর্লভ বোধিজ্ঞান লাভ না করিলে এই আসন হইতে আমার শরীর টলিবে না।

তাঁর এই কঠোর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। তিনি জীবনের পথ পাইলেন। দৃষ্টি নূতন আলোকে ভরিয়া গেল। ধ্যান-যোগে তিনি জগতের সৃষ্টিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন ঃ—

১। অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
২। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান।
৩। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
৪। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
৫। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
৬। স্পর্শ হইতে বেদনা।
৭। বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
৮। তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।
৯। উপাদান হইতে ভব।
১০। ভব হইতে জন্ম।

জন্মই দুঃখের কারণ। জন্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ করা চাই। তিনি সর্ব্বদুঃখের মূলের সন্ধান পাইয়া তাহার উচ্ছেদ-মানসে যত্নপর হইলেন, বজ্রকণ্ঠে গাহিলেন—

অনেকজাতি-সংসারং সন্ধাবিস্সম্
গহকারকং গাবসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং না কাহসি
সর্ব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংঘিতং
বিঝংখার গতং চিত্তং তন্‌হানং খয় মজ্ঝগা।

বহুজন্ম সংসার-পথে ফিরিতেছি ; এ গৃহ যে নির্ম্মাণ করিয়াছে সে কোথা গোপনে আছে, তাহার সন্ধান পাই নাই। পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া এবার দেখা পাইয়াছি। হে গৃহকারক! স্তম্ভ ও গৃহ-ভিত্তি চূরমার করিয়াছি, চিত্ত সংস্কারহীন হইয়াছে, তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়াছে, আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।

জীবের দুঃখ অপনোদনের পন্থা আবিষ্কার করিতে সর্ব্বত্যাগী বুদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। তাঁর দুর্জ্জয় তপঃশক্তি জীবন নিরাময় করিল না ; জীবনের ভিত্তি উপাড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে এইরূপ মারাত্মক ভুলের ইহাই প্রথম ভিত্তিপাত। বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধধর্ম্মীরাও পরবর্ত্তী যুগে এক প্রকার এই শূন্যবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। জীবনের মূল আমাদের ক্ষয় পাইয়াছে ; এ ক্ষয় সহজে পূরণ হইবার নয়। অতীত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কি ঘোরতর সংগ্রামের উপর ভবিষ্যতের জয় নির্ভর করিতেছে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে!

বুদ্ধ বিচার করিয়া দেখিলেন—সংসার দুঃখময়। এই ক্ষেত্রে সুখের সন্ধান নির্ব্বুদ্ধিতা। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণে দুঃখ, জীবন থাকিলেই এইগুলি নিত্য সঙ্গী হইবে—অপ্রিয় বস্তুর সঙ্গ নিরন্তর দুঃখের কারণ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ! এ সংসার বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।

সংসারের সৃষ্টি—বিষয়তৃষ্ণায়। আসক্তিই দুঃখের কারণ। উহা বর্জ্জনীয়। আসক্তির সম্যক্ মূলোৎপাটনেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

তারপর, তিনি রোগের ঔষধ নির্ণয় করিলেন: ইহাই বুদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ পথ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি।
২। সম্যক্ স্পর্শ। (অটুট স্পর্শ-রক্ষার শক্তি)
৩। সম্যক্ বাক্য। (সত্য বাক্)
৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত। (সদাচার)
৫। সম্যক্ আজীব। (অহিংসা সাধন)
৬। সম্যক্ ব্যায়াম। (সংযম-সাধনা)
৭। সম্যক্ স্মৃতি।
৮। সম্যক্ সমাধি। (ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসন যোগে সুগভীর তত্ত্বে অবগাহন)

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে বুদ্ধ আস্থা হারাইলেন। ধর্ম্ম-সাধনায় ভজন-পূজনের ব্যবস্থা তিনি রাখিলেন না, অন্তর-সাধনাকেই প্রবল করিয়া তুলিলেন। অষ্টাঙ্গসাধন-বিধির দ্বারা অবিদ্যার বাঁধন কাটিবার পথে তিনি আরও বন্ধন-গ্রন্থীর সন্ধান পাইলেন। দশবিধ শৃঙ্খলের কথা বৌদ্ধধর্ম্মে সুপ্রচারিত—

১। সক্কায় দৃষ্টি (অহঙ্কার)
২। বিচিকিৎসা (সংশয়)

৩। শীলব্রত (কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা)

৪। কাম

৫। প্রতিঘ (ক্রোধ)

৬। রূপ-রাগ (বাসনা)

৭। অরূপ-রাগ (স্বর্গকামনা)

৮। মান (অভিমান, মাৎসর্য্য প্রভৃতি)

৯। ঔদ্ধত্য।

১০। অবিদ্যা।

নির্ব্বাণের পথে যে ভাবগুলি গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি সেইগুলিব এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। সাধকের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য নহে। অবিদ্যার শিকড় উৎপাটন করার পূর্ব্বে, অহং-ত্যাগের প্রয়োজন। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের মোহ দূর না হইলে, অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হওয়া দুরূহ। কামক্রোধাদি রিপুর নিরসনের কথা নূতন নহে; বাসনা, স্বর্গাদি-কামনা ত্যাগ করার কথা হিন্দুর যোগশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তবে বুদ্ধদেব চাহিয়াছেন এইগুলির আমূল উচ্ছেদ; গীতা উপনিষদে আছে শোধনের ব্যবস্থা। বোধিসত্ত্ব রিপুর দমন চাহেন না, চাহেন মূলোৎপাটন করিতে। ঠাকুর যেমন বলিতেন— "অহং যখন যাবে না, তখন থাক্ ইহা 'দাস আমি' হ'য়ে, 'ভক্ত আমি' হয়ে"—কিন্তু বুদ্ধ তো জীবন চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন নির্ব্বাণ। শূন্য তাই তাঁর চক্ষে নিত্যাবস্থা-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি সৃজনের বিদ্যমানতার

মধ্যে অমৃতের সন্ধান অসম্ভব দেখিয়াছিলেন ; তাই জন্ম-সংস্কারের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবিকৃতভাবে রক্ষা করায় ভারত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। ইহার পরবর্ত্তী যুগে, এই জীবনের বিরোধী ধর্ম্মতত্ত্ব হজম করিয়া শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, বৌদ্ধপ্রভাবই শঙ্করের ধর্ম্মপ্রচারে জয়যুক্ত হইয়াছে—কর্ম্মকাণ্ডে জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। বুদ্ধের অবিদ্যা-জয় ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব, আর শঙ্করের মায়াবাদ একই সামগ্রী।

বোধিসত্ত্ব জীবনের কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া, অষ্টাঙ্গসাধনার শক্ত হাতুড়ী উঠাইয়া গ্রন্থীর পর গ্রন্থী চূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবতারা তাঁর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃহস্পতি তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তিনি প্রথমেই ত্রিপুষ ও ভল্লিচ নামক বণিদ্দ্বয়কে এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ; তারপর ভাগীরথীতীর ধরিয়া ভারতের মহাতীর্থ বারাণসীধামে গিয়া, তাঁর পূর্ব্ব পঞ্চশিষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাহারা প্রথমে বুদ্ধদেবের কথায় আস্থা স্থাপন করে নাই ; কিন্তু অপার্থিব অন্তরবলের প্রভাবে বুদ্ধ তাহাদের হৃদয় জয় করিলেন—এই পঞ্চশিষ্যের মাথাও বুদ্ধের চরণে অবনত হইল। ভারতে বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মপ্রচারের ইহাই সূচনা।

বুদ্ধদেব সিদ্ধ হইয়া ৪৫ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রথম বৎসরেই তিনি ৬০ জনকে নিজ মতে দীক্ষা দেন। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হন। তিনি বেণুবন নামক এক উদ্যানভূমি বুদ্ধদেবকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করেন। ইহা বৌদ্ধসমাজের পরম তীর্থ। সিদ্ধার্থ এইখানে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

এক সময়ে তিনি কপিলাবস্তুতে গিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইয়া দ্রুত আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখে আর বাণী সরিল না—কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশভার, সুমসৃণ-মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আর সে মূর্ত্তি নাই। নগ্নপ্রায়, তাম্রকান্তি, উন্নত দেহ, মুণ্ডিত কেশ, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, করুণায় চক্ষু অশ্রুবিগলিত, চরণে সহস্র সহস্র নরনারীর মাথা নত হইতেছে। শুদ্ধোদন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; বহু কষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"বৎস, এ কি করিতেছ? ইহা কি শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজের উচিত কার্য্য!" সিদ্ধার্থ মৃদুমধুর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"কি মহারাজ!" সে প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে রাজার চক্ষু নত হইল, তবুও তিনি বলিলেন—"বৎস! ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভিক্ষাবৃত্তি—ইহা যে বংশের, কুলের অমর্য্যাদা!"

শাক্যসিংহ উত্তর দিলেন—“আমার কুল নাই, বংশ নাই, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদের অনুগামী, চিরন্তন প্রথায় আমি ভিখারী—মহারাজ ভিক্ষা দিন!” শুদ্ধোদন অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষুব্ধ অন্তরেই বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আসিলেন।

বুদ্ধ আজ আর শাক্যবংশের কুলপ্রদীপ নয়, বুদ্ধ আজ আর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসজাত সন্তান নয়, বুদ্ধ সম্পূর্ণ গোত্রান্তরিত হইয়া নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ম্মম কণ্ঠে সমাগত রাজপুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উপদেশ দিলেন—বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব চতুরার্য্যসত্য, অষ্টাঙ্গ-মার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বতশান্তিরূপিণী নির্ব্বাণমুক্তি।

অনর্গল অমৃতবর্ষী বাণী তাঁর কণ্ঠে নির্গত হইল। শুদ্ধোদন আকুল হইয়া বুদ্ধকে আলিঙ্গন দিলেন—কপিলা-বস্তুর অসংখ্য নরনারী বুদ্ধের শরণাগত হইল।

বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে রাজপরিবারস্থ সকল নারীপুরুষই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিল; কিন্তু যশোধরাকে তিনি দেখিলেন না, শুনিলেন —তিনি আসিবেন না। বুদ্ধের হৃদয়ে করুণার বাণ ডাকিল। তিনি অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে কক্ষে যশোধরা ছিলেন, সে কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পতিপরায়ণা সতীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অশ্রুর উৎস

উথলিয়া উঠিল। বুদ্ধ দেখিলেন—আলুলায়িতকুন্তলা যশোধরার ধ্যানমূর্ত্তি। তিনি মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন, "যশোধরা, গোপা!" সেই চিরপরিচিত কণ্ঠ! যশোধরা উন্মাদিনীর মত বুদ্ধের চরণ জড়াইয়া ধরিলেন; বুদ্ধ বুঝিলেন—পতিবিরহে সতী কি ক্লেশে জীবনের দিন গুণিয়াছে! তিনি তাঁহাকে যশোধরার পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন। যশোধরা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হইলেন। ইনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। পুত্র রাহুলও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিল। রাজা শুদ্ধোদন হতবুদ্ধি হইলেন। বুদ্ধদেব পুনরায় ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইলেন। রাজপরিবারের তিনজন তাঁর অনুগামী হইয়াছিলেন। রাজনাপিত উপালীও বুদ্ধের সঙ্গ ছাড়িল না। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। স্বীয় শ্যালক দেবদত্ত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই শেষ পর্য্যন্ত বিপক্ষতা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারায় মনঃক্ষোভে গয়ানদীতীরে নিজ বিহারে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম—কঠোর বৈরাগ্যমূলক। আনন্দ বৌদ্ধবিহারে নারীগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করায়, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—নারী-সংসর্গে তপস্যা হীনপ্রভ হইবে; আমার মৃত্যুর পরও এইভাবে যদি তোমরা চল, তাহা হইলে এক

হাজার বৎসর আমার ধর্ম্মপ্রভাব সমান ভাবেই থাকিবে ; কিন্তু নারী বিহারে প্রবেশ করিলে ইহা অধিক দিন টিকিবে না। কিন্তু তিনি বিহারে নারীগ্রহণ নিবারণ করিতে পারেন নাই। প্রথমেই তিনি স্বীয় ধাত্রী মহা-প্রজাপতিকে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বেশ্যা অম্বপালী বুদ্ধের অনুগ্রহ পাইয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। বিশাখা, বসুজাতা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধভিক্ষুণী বৌদ্ধ-বিহারের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিহারে ভিক্ষুণীর স্থান দিয়া তিনি কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন। পরনারীসম্ভোগেচ্ছার অপেক্ষা তপ্ত লৌহ শরীরে বিদ্ধ করা ভাল—তিনি এইরূপ উপদেশ দিতেন, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষুণীরা যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বর্ষাকালে ভিক্ষুহীন দেশে ভিক্ষুণীদের বাস করিতে হইত, ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতীত ভিক্ষুণীরা উপবাস বা কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিত না।

ভিক্ষুদের প্রতি তাঁর কঠোর আদেশ ছিল-

১। অকালে ভোজন করিবে না।

২। নাট্যাদি দর্শন করিবে না।

৩। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিবে না।

৪। প্রশস্ত শয্যায় শয়ন করিবে না।

৫। মাল্যগন্ধ ধারণ ও লেপন করিবে না।

৬। ভূষণ ধারণ করিবে না।

৭। রৌপ্যাদি স্পর্শ করিবে না।

শ্মশানের ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ, ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ, অরণ্য আশ্রমে, বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুদের আত্ম-সাধনায় রত থাকিতে হইত। ব্যাধি হইলে গোমূত্র ব্যতীত অন্য ঔষধ সেবন করার অনুমতি ছিল না। শিষ্যদের প্রতি চারিটী অনুশাসন ছিল।

১। ব্যাভিচার করিবে না।

২। চুরি করিবে না।

৩। হত্যা করিবে না।

৪। দৈবশক্তির আশ্রয় লইবে না।

আত্মদর্শনের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য দুর্গম পথে, বৃহত্তর আহ্বানে ভারতের কোটী কোটী নরনারী স্বহস্তস্যূত চীর-খণ্ডে কটিতট আবৃত করিয়া ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছিল। বুদ্ধ বলিতেন—শিষ্যেরা যতদিন শুদ্ধাচারী হইয়া সৎপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত জোতিঃ বিকীরণ করিবে। পাঁচ হাজার বৎসর পরে এই সত্য যখন :সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবে, তখন তিনি মৈত্রেয় নামে নব বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে জগতে অবতরণ করিবেন।

এই আড়াই হাজার বৎসর করুণার অবতার বুদ্ধদেব ধরিত্রীর কোল-ছাড়া, মানবপ্রীতির নির্ঝর শুষ্ক, পৃথিবী

আজ মরুভূমি—বুদ্ধের পুনরাগমনপ্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ দিন আমরা টিকিব কি !

কপিলাবস্তু হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে পাবা গ্রামে বুদ্ধ এক আম্রবনে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিষ্য কুন্দ কর্ম্মকার বরাহ-মাংস রন্ধন করিয়া বুদ্ধের সম্মুখে উপহার দিল। আনন্দ বিরক্ত হইলে, বুদ্ধ বলিলেন —সুজাতার অন্নে জীবনের নূতন প্রভাত ; কুন্দের পক্বান্ন অতি আদরের সহিত আমায় ভোজন করিতে হইবে। আনন্দ আর আপত্তি তুলিলেন না। এই তাঁর শেষ আহার। পাবা গ্রাম হইতে কুশীনগরের হিরণ্যবতী নদীতীরে সুবিস্তৃত শালবনে তিনি অসুস্থ হইলেন। আনন্দ বিলাপ করিতে লাগিলেন, বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"শোক করিও না। যার জন্ম তার ক্ষয় ; তোমরা সত্য ধর্ম্ম পালন কর।" এইখানেই ভারতের সূর্য্য অস্তমিত হইল। আলো নিভিল। বৌদ্ধবিহারে ব্যাভিচার আরম্ভ হইল। সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। বুদ্ধের মহিমা দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া, আজ ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়াছে। রাজা অশোকের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ-মহিমা মাথা তুলিয়াছিল। সে নিদর্শন, সে গৌরবযুগের ইতিহাস ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐ বিশাল লৌহস্তম্ভ ঐশ্বর্য্য ও কীর্ত্তির জয়স্তম্ভ-রূপে আজও বর্ত্তমান। বুদ্ধ নাই ; কিন্তু

তাঁর কীর্ত্তি আছে, ত্যাগবৈরাগ্যের প্রভাব আছে। আদরে অনাদরে ধ্যানী বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্ত্তি আবালবৃদ্ধবণিতার পরিচিত দেবতা। বৌদ্ধধর্ম্ম নাই; কিন্তু বুদ্ধের প্রতি-মূর্ত্তি ভারতের হৃদয়ে চির জাগরূক রহিয়াছে।

এস বুদ্ধ, ভারতের পুণ্যভূমি তোমার পদচিহ্ন বুকে আঁকিয়া মৈত্রেয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত। ধরার ভার হরণ করিতে আবার অবতীর্ণ হও, আবার কোটি কণ্ঠে ধ্বনি উঠুক—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

* *
*



শঙ্করাচার্য্য

শঙ্করাচার্য্য

শাক্যসিংহের তিরোধানের পর, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় একহাজার বৎসর ভারতে জয়চ্ছত্র উড়াইয়া প্রচারিত হয়। শুধু ভারতবর্ষ কেন, ফরাসী দেশের একজন প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত ও জর্ম্মনীর লিত্রাবার আট্ নামক একজন ধর্ম্মপ্রচারক জোসেফট্ নামক একজন মহাপুরুষের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান; ইনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ডবাসী বাল্ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেন। ইউরোপের সায়নাচার্য্য মোক্ষমুলার ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আরব-সাম্রাজ্যের অমাত্য একজন গ্রীক পণ্ডিত জ্যোঅন্নস্ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক যুসফ বলিয়া প্রমাণিত করেন, ইহা ৭২৩ খৃষ্টাব্দের কথা। আরবীয় গ্রন্থেও বুদ্ধচরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এই বৌদ্ধ উপাখ্যান এক সময়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইত। সম্প্রতি আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সমগ্র জগতে

বিস্তৃত হইয়াছিল ; বোধিসত্ত্বের কাহিনী আরবী, আর্ম্মানী, ইথিয়োপিক, ল্যাটিন্, ফরাসী, ইটালীয়, ইংরাজী, স্পেনিশ্ ও পোলিশ্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরাবতার যুগ-পুরুষগণের অপেক্ষা ভারতের মহিমা বুদ্ধের আবির্ভাবে যে জগন্ময় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মতত্ত্ব জটিল অধ্যাত্মমূলক নয়, জীবন-তত্ত্বের অমৃতময় নীতি জীবমাত্রের অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিত ; জাতি-নির্ব্বিশেষে সাধননীতি প্রবর্ত্তিত হইত। বুদ্ধের উপদেশ, নীতি ও অনুশাসন পৃথিবীর সকল জাতিকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছে। হিন্দু বলিয়া যে জাতি আজ ভারতে স্থান পাইয়াছে, তাহারা বৌদ্ধদের নিকট যে কতখানি ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জগতে এই বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথম বিশ্বজাতি-সৃজনের মূল। মহম্মদীয় ও খৃষ্ট ধর্ম্মেও বোধিসত্ত্বের যে কি অমর প্রভাব সঞ্চারিত, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, :যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন জয়চ্ছত্র প্রথম উড়িল, সেই জন্মক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধদের চির বিসর্জ্জন সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে ভারতের উন্নতি কি অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিবে ?

বৌদ্ধধর্ম্মের পর ভারতে যে মায়াবাদের প্রচার হইল, তাহা বুদ্ধদেবেরই জয়কীর্ত্তি। তাঁর প্রচারিত

নির্ব্বাণ-মুক্তিই পরবর্ত্তী যুগের মায়াবাদ। মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণরাশি—অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি মূর্ত্ত হইয়াছে; চৌর্য্য, মৃত্যুভয়, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রকে দেবনিবাসে পরিণত করার পথপ্রদর্শক কে—শাক্যকুলপ্রদীপ বুদ্ধদেব নহেন কি? জীবাধারে দেবাসুরসংগ্রামের মত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিত্যকাল ধরিয়া চলিয়াছে। প্রধানতঃ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ অধিকার করার জন্য সংগ্রামনিরত। সেই ধর্ম্মসংঘর্ষে বৌদ্ধেরা কতকটা ম্লান হইয়া পড়ে। এই অবনতির মূল কারণ—হিন্দুর আত্ম-রক্ষণনীতি। হিন্দু দেখিল—বৌদ্ধপ্রভাবে দেশ ভাসিয়া যায়, তাহা রোধ করা বড় সহজ নহে। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের ছত্রতলে তাহারা ছদ্মবেশে মিত্র ভাবেই প্রবেশ করিল। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মহিমা জুড়িয়া দিল। বুদ্ধ, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি একই তীর্থে প্রতিষ্ঠা পাইল। তারপর বুদ্ধ যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা, তখন এই সঙ্গে দেবশক্তির পূজারও ব্যবস্থা হইল—তারা, কালী প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। বুদ্ধের তপস্যা পরিশেষে 'ওঁ', 'আঁ', 'হুং', 'ফট্' প্রভৃতি মন্ত্র-সহযোগে নানাবিধ উপচার সহকারে সাধন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিল। মৌর্য্য-

বংশের পতনের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির ধারাবাহিক আক্রমণে যখন বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষায় উদ্যত রাজবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত, সেই অবকাশে জৈন ও হিন্দুরা আত্মধর্ম্মের প্রাধান্যপ্রচারে অধিকতর ব্যগ্র হইয়া পড়িল। কোন কোন নৃপতি জৈন বা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া, বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দেশান্তরিত করিতে আরম্ভ করিলেন, বৌদ্ধবিহারে নররক্তের স্রোতও বহিল। বৌদ্ধের মহাযান, হীনযান উভয়ই তখন শক্তিহীন। আবার মুসলমান আক্রমণে তাহাদের সহস্র বৎসরের যশঃ-স্তম্ভ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। রাজা অশোক হইতে হর্ষদেব পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ কীর্ত্তিচিহ্ন মুসলমানের অস্ত্রফলকে নির্ম্মূল হইল। তখনও তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, নালান্দায় বৌদ্ধ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু কালপ্রভাবে আজ মাত্র ইতিহাসের পাতায় অতীতের স্মৃতি আঁকা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিসর্জ্জনে ভারতবর্ষ নির্ব্বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যহীন হইল। আর কখনও মৌর্য্য ও গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারতকে একযোগে শাসন করিবার জন্য শৃঙ্খলিত সাম্রাজ্যগঠনে বীরহস্ত প্রসারিত করিবেন কি না জানি না! আজ ধর্ম্মবিরোধের শ্মশানক্ষেত্রে জৈনের কঙ্কাল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রেত আর হিন্দুত্বের শূন্য দম্ভ নৃত্য করিতেছে; ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ—ধর্ম্মহীন, উৎসন্ন হওয়ার পথে। শঙ্করের মায়াবাদ বিলাপধ্বনির মত ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পর্য্যন্ত আজও ধ্বনিত। তবুও

বুদ্ধের মত, মহম্মদের মত, খৃষ্টের মত এক একটা মানব-সমষ্টিকে পৃথিবীর বুকের উপর দৃঢ়মূল করিবার শক্তি দেয় নাই—অধ্যাত্ম জীবন দিয়াছে, অপবর্গের পথ দেখাইয়াছে, কিন্তু এই বাস্তব জগতে টিকিয়া থাকার মত শক্তি দেয় নাই, ভোগ ও অপবর্গের সামঞ্জস্যবিধান করে নাই।

নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষ গভীর জীবন-তত্ত্বের আবিষ্কার-পথ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্ম বলিতে আনুষ্ঠানিক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও বিধ্বস্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রেতমূর্ত্তি বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ দেশ জুড়িয়া বসিল। শুষ্ক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্মবাদে ভারত যেদিন আত্মজ্ঞানহীন বিমূঢ়-প্রায়, তখন যেমন মহামতি বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া অন্তঃশুদ্ধির নীতিধর্ম্মে ভারতবর্ষকে অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইয়া-ছিলেন, শঙ্করও তদ্রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের নবীনতাহ্রাসের সঙ্গে যে অনাচার ও নাস্তিকতা প্রশ্রয় পাইল তাহা খণ্ডন করিয়া ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান, জীবাধেয় আত্মবাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিল; শঙ্কর আসিয়া বলিলেন—আমরা শুধুই আত্মা নহি, পরমাত্মা, অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সত্তা।

"অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
বিভুর্ব্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্॥"

এই জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদপ্রচারের সঙ্গেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শুষ্ক নীতিবাদের মূল উপড়াইয়া তিনি ভক্তির গঙ্গাপ্রবাহ জাতির জীবনে সঞ্চারিত করিলেন। ভারত নবধর্ম্মের আস্বাদে আবার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্করাচার্য্য নবম শতাব্দীর প্রথমেই দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশে কালাড়ি নামক গ্রামে নাম্বুরি নামক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল—শঙ্করের পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন দিয়া গুরুগৃহে তাহাকে বেদাভ্যাসে নিযুক্ত করেন; পিতার মৃত্যুর পর শঙ্করের মাতাই ইহা কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি দুই বৎসরের মধ্যেই যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন।

আচার্য্য শঙ্করের জীবন অলৌকিক ঘটনাসঙ্কুল। গুরুগৃহে অবস্থানকালে তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন; ব্রাহ্মণী অতিথিকে বিমুখ না করিয়া একটী আমলকী ফল ভিক্ষা দেন এবং তাঁহার কাছে নিজেদের দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করেন। শঙ্করের কোমল হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হওয়ায়, তিনি এই দরিদ্র পরিবারের জন্য লক্ষ্মীদেবীর নিকট ধন প্রার্থনা করেন। ইহার পর হইতেই দৈবানুগ্রহে ইহারা প্রভূত ধনশালী হয়। এই ঘটনার প্রচারে শঙ্করের নাম দেশময়

ছড়াইয়া পড়ে। আরও একটী ঘটনায় শঙ্করের অসাধারণ জীবনের প্রতি সকলে নিঃসংশয় হয়।

কালাড়ি গ্রাম হইতে আলোয়াই নদী তখন কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। শঙ্করজননী প্রতিদিন এই নদীতে স্নান করিতে গিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে একদিন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হন। সন্ধ্যা আগত, অথচ মাতার এইরূপ অযথা বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কর নদীপথে যাত্রা করিয়া জননীর এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁর মনে হইল—আলোয়াই যদি গ্রামপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে জননীর আর এই দুঃখ হয় না। চিন্তামাত্রে তিনি একান্ত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন ; নদীপ্রবাহও বাঁকিয়া তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় এবং শঙ্করের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া দেশের রাজা পর্য্যন্ত শঙ্করের প্রতি অনুরক্ত হন ; কিন্তু তিনি রাজানুগ্রহ বিনীতভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন। রাজা ইহাতে রুষ্ট না হইয়া আরও অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। শঙ্করের এইরূপ প্রভাববৃদ্ধি হওয়ায় ভক্তের সংখ্যার সঙ্গে শত্রু-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল।

কথিত আছে, কয়েকজন ঋষিকল্প মহাপুরুষ শঙ্করের এই অল্প বয়সে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁর গৃহে উপস্থিত হন এবং শঙ্করের জন্মকোষ্ঠী দেখিবার

অভিলাষ প্রকাশ করেন। কোষ্ঠীর বিচারে শঙ্করের অসামান্য চরিত্রলক্ষণের সঙ্গে তাঁর অল্পায়ুঃ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। শঙ্কর মাত্র ষোড়শ বর্ষ জীবনধারণ করিবেন, এই কথা শুনিয়া বিধবা মাতা আকুল হইলেন। শঙ্করের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল; কিন্তু জননীকে তিনি কোন মতে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না।

একদিন শঙ্কর কার্য্যোপলক্ষে নদীপারে গমন করেন; প্রত্যাবর্ত্তন-কালে নদীমধ্যে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর-জননী দ্রুত নদীতীরে উপনীত হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কর স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার মৃত্যু আসন্ন; যদি সন্ন্যাসগ্রহণের আদেশ দেন, হয়তো এ যাত্রা রক্ষা পাই"—এই বলিয়া কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। পুত্রের প্রাণ-সংশয় দেখিয়া, মাতা এই অবস্থায় নীরব থাকিবেন কেমন করিয়া? তিনি সন্ন্যাসগ্রহণে সম্মতি দিলেন; শঙ্কর কুম্ভীরের করালগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন।

অষ্টম বর্ষে শঙ্কর বিধবা জননীর চক্ষে অশ্রু ঝরাইয়া গৃহত্যাগ করেন। জ্ঞাতি শত্রুর মধ্যে অসহায়া মাতাকে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া বিধাতার সঙ্কেতে তিনি অনির্দ্দেশ্য জীবনপথে ধাবিত হইলেন। মায়ের কাতরতা

দেখিয়া তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু কি এক অভাবনীয় শক্তি আসিয়া তাঁর হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিল। তিনি মাতার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া কালাড়ি গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

গুরুগৃহে শঙ্কর যখন পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তখন শুনিয়াছিলেন—নর্ম্মদানদীতীরে পতঞ্জলী সমাধিযোগে এখনও অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিলেন। কালাড়ি হইতে নর্ম্মদা অল্প দূর নহে। কত নিবিড় নদী বন অতিক্রম করিয়া তিনি চলিলেন, পথে শুভ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক-বসন পরিধান করিলেন। অষ্টম বর্ষীয় বালকের অন্তরে ভগবানের বজ্রসঙ্কেত হুঙ্কার দিয়াছে। তিনি দ্রুতপদে এক মাস পরে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন।

লোকমুখে জানিলেন—এক গুহায় গোবিন্দপাদ নামক যোগী বহু বর্ষ ধরিয়া সমাধিস্থ আছেন। কতলোক তাঁর সমাধিভঙ্গের আশায় গুহাদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর বুঝিলেন—'এই আমার লক্ষ্য পতঞ্জলী; তিনি গুহা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইল—শঙ্করের এক একটি কণ্ঠরবে, যোগীর নিমীলিত আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে যেন খুলিয়া আসিতেছে। শঙ্করের স্তব শেষ হইলে, গোবিন্দপাদ চক্ষু মেলিলেন; সম্মুখে গৈরিক-পরিহিত অসাধারণ লাবণ্য-

শালী এই বালককে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তার পর পদদ্বয় গুহার বাহিরে প্রসারিত করিলে, শঙ্কর গুরুপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুধারায় ধৌত করিলেন। গোবিন্দপাদ নিঃসংশয় হইলেন ; অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন —তিনি ইঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে শঙ্করকে তিনি যোগশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে বর্ষাকাল উপস্থিত। নর্ম্মদার স্ফীত বক্ষ তরঙ্গ তুলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তীরে আসিয়া আছাড় খাইতে লাগিল। জলস্রোতঃ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইল। তীরবর্ত্তী বহু লোকের গৃহাদি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। উন্মত্ত জলতরঙ্গ ক্রমে গোবিন্দপাদের গুহাদ্বারে আসিয়া মাথা তুলিল। যোগিবর তখন গভীর ধ্যানমগ্ন। শঙ্কর দেখিলেন—এই মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ না করিলে ডুবিয়া প্রাণ দিতে হইবে, অথচ গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গ করাও বিধেয় নয়। নানা চিন্তার পর তিনি যখন দেখিলেন—আর অপেক্ষার সময় নাই, তখন গুহা হইতে একটী শূন্য কুম্ভ লইয়া সমস্ত তরঙ্গকে ইহার মধ্যে রুদ্ধ করিলেন—নর্ম্মদা-প্রবাহ যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ধ্যানভঙ্গে শঙ্করের এই অসাধারণ কীর্ত্তির কথা জানিয়া গুরু সন্তুষ্ট হইলেন এবং শঙ্করকে যোগসিদ্ধ বুঝিয়া বলিলেন—"বৎস, এইবার তোমায় কাশীধামে যাইতে হইবে, বিশ্বেশ্বর তোমার ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিবেন। মহামুনি ব্যাস

হিমালয়ে একদিন আক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্র নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় ইহার মর্য্যাদা নষ্ট হইতেছে; তখন শিব বলিয়াছিলেন, যে তিনি অবতীর্ণ হইয়া এই কার্য্য করিবেন। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি ইহাই বলিয়াছিলেন, যে যখন দেখিবে কোন লোক সহস্রধারা নর্ম্মদার প্রবাহ এক শূন্য কুম্ভে আবদ্ধ করিবেন, জানিবে—সেই ব্যক্তিই সহস্র বিরূপ শাস্ত্রমত এক করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের সাহায্যে এক উচ্চতম মত স্থাপন করিবেন। সেই সময় হইতে আমিও নর্ম্মদা-তীরে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি; তুমি স্বয়ং শঙ্কর, আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে; অতঃপর স্বয়ং পার্ব্বতীনাথ তোমার পথ নির্দ্দেশ করিবেন।"—এই বলিয়া গোবিন্দপাদ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আচার্য্য শঙ্কর কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতের এই পবিত্র তীর্থে বসিয়া তিনি বেদ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিলেন। সনন্দন প্রভৃতি বহু শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি কাশীর বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন।

শক্তিবাদে তাঁর আস্থা ছিল না। একদিন তিনি দেখিলেন—এক যুবতী ক্রন্দন করিতেছে, তাহার সম্মুখে একটী মৃতদেহ পথ জোড়া করিয়া পতিত রহিয়াছে;

তিনি রমণীকে ইহা কিঞ্চিৎ সরাইয়া লইতে বলিলেন। রমণী উত্তর দিল, "আমায় বলেন কেন, শবদেহকেই বলুন না!" শঙ্কর উত্তর করিলেন, "শবের কি শক্তি আছে!" রমণী উপহাস করিয়া বলিল, "শক্তি সর্ব্বব্যাপী হইলেও, তার বিশেষ অভিব্যক্তি আছে, ভেদ আছে।" শঙ্কর নিরুত্তর হইলেন। পুরুষ-প্রকৃতি-বোধের দুয়ার মুক্ত হইল। তিনি কাশীর অন্নপূর্ণার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রকৃতিবাদের সার্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করিলেও, জীবে ও শিবে তাঁর ভেদ-জ্ঞান ছিল। কথিত আছে, স্বয়ং শঙ্কর চণ্ডাল-বেশে তাঁর ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেন। যদিও এই সকল উপকথার ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই; তত্রাপি ঘটনার আবর্ত্তনে আচার্য্য শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ভারতের পৌত্তলিকতার মূল শক্ত করিয়াছে, শিথিল করে নাই। তাঁর শিষ্যগণ ভবিষ্যতে অদ্বৈত মায়াবাদী হইলেও, সম্প্রদায়-বিশেষের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভারতের ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

এই সময়ে কুমারিল ভট্ট ও দিবাকর প্রভৃতি আচার্য্য-গণের বৈদিক আচার ও ধর্ম্ম ভারতে বৌদ্ধবাদ নিরসন করিয়া সনাতন ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ ভিত্তিপাত করিয়াছিল; কিন্তু কেবল কর্ম্মকাণ্ডের প্রচারে, বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। আচার্য্য এই সুমহৎ

জ্ঞানের উপর ভারতের ধর্ম্ম যাহাতে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কুমারিল ভট্টকে স্বমতে আনিতে পারিলে ইহা সিদ্ধ হইবে, এই আশায় তিনি বদরিকায় গিয়া কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কুমারিল তখন তুষানলে মহাপ্রয়াণের আয়োজন করিয়াছেন। শঙ্কর বিচারপ্রার্থী হইলে, তিনি সঙ্কল্পত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন—তাঁর শিষ্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিলে শঙ্করের মত অবধারিত গ্রাহ্য হইবে। কুমারিলের পারলৌকিক শুভকামনা করিয়া শঙ্করাচার্য্য তদীয় সর্ব্বপ্রধান শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের আলয়ে উপনীত হইলেন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জীবন নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। বদরিকা হইতে শূন্যমার্গে তিনি মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। সহসা শঙ্করাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু শঙ্করের প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে ও বিনয়পূর্ণ বচন শ্রবণে সান্ত্বনালাভ করিলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ দিন উভয়ের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ চলিল। মণ্ডন-পত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থা ছিলেন, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উভয়ের কণ্ঠে সদ্য-প্রস্ফুটিত শ্বেত কুসুমের মালা পরাইয়া দিতেন। উদ্দেশ্য—তর্কে যাঁহার পরাজয় হইবে, তাঁহার কণ্ঠমাল্য মলিন হইবে।

মণ্ডনের পরাজয় হইল। শঙ্কর এইবার দিগ্বিজয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পত্নী উভয়ভারতী স্বামীর পরাজয় স্বীকার করিলেন না, বলিলেন—"স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, শঙ্করের জয় এখনও পূর্ণ হয় নাই।" তিনি তাঁহাকে কামশাস্ত্র লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। আকুমার ব্রহ্মচারী আচার্য্য এই শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ মণ্ডন-পত্নী পরাজয় স্বীকার না করিলে তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের পথ প্রশস্ত হয় না; এই হেতু তিনি একমাস সময় প্রার্থনা করিয়া মণ্ডনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিষ্যগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

আচার্য্য কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শিষ্যগণ এই দুরূহ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে বলিলেন; কিন্তু এই দুর্জ্জয় পণ কেহই ভঙ্গ করিতে পারিল না। রাজা অমরকের দিন ফুরাইয়াছিল; তাঁর মৃতদেহে শঙ্কর প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার দেহ রক্ষা করিও, একমাস পরে আমি ফিরিব।" শিষ্যগণ পর্ব্বতগুহায় শঙ্করের অচেতন শরীর লইয়া বসিয়া রহিল।

শঙ্কর প্রবেশ করিবার পর রাজা অমরকের আচরণ নূতন ধরণের দেখিয়া মহিষীগণ বিস্মিত হইলেন। ক্রমে রাজশরীরে যে কোন মহাপুরুষ আশ্রয় করিয়াছেন,

ইহা তাঁহারা বুঝিলেন—অমাত্যগণকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন, যে রাজশরীর রক্ষা করিলে রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ হইবে ; কেননা, ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন এক মহাপুরুষ আশ্রয় করিয়াছেন। অমাত্যগণ পরামর্শ করিয়া রাজ্যে যত মৃতদেহ সব নষ্ট করার জন্য ঘোষণা করিয়া দিল ; কেননা, তৎকালে যোগবলে সিদ্ধপুরুষগণ মৃতদেহে প্রবেশ করিতেন। সিদ্ধ পুরুষের পূর্ব্ব শরীর নষ্ট করিতে পারিলে, এই শরীরেই তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হইবে।

শঙ্করের শিষ্যগণ প্রমাদ গণিলেন। রাজভৃত্যেরা শঙ্করের শরীর খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া সকলে কৌশলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন ও রাজশরীরে আবিষ্ট শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্যে রাখিয়া তাঁহারা মোহমুদ্গর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। শিষ্যগণ আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। রাজা অমরকের মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি গতায়ুঃ হইলেন। এই সময়ে শঙ্করের শরীর রাজভৃত্যগণ চুল্লীর উপর উঠাইয়াছে, অগ্নি-সংযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শঙ্করশিষ্য সনন্দ নৃসিংহ দেবের ভক্ত ছিলেন ; তিনি কায়মনোবাক্যে গুরুর দেহরক্ষার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। বহু আয়াসে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা কাহারও সাধ্যে আর কুলাইল না। ইত্যবসরে বিগতজীবন অমরকের শরীর

হইতে আচার্য্য বাহির হইয়া নিজ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র মৃতদেহ উঠিয়া বসিল। রাজভৃত্যগণ সভয়ে পলায়ন করিল।

শঙ্কর অতঃপর মণ্ডনমিশ্রের নিকট গমন করিলে, উভয়ভারতী শঙ্করের গলায় জয়মাল্য প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ইনি শাপভ্রষ্টা ব্রহ্মগায়ত্রী। মণ্ডন সংসারপাশমুক্ত হইয়া শঙ্করকে গুরুপদে বরণ করিলেন। ভারতে বেদান্তের জয়চ্ছত্র উড়িল।

কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ, আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র আচার্য্য বেদান্ত প্রচার করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন। চারিজন তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। ইঁহাদের জীবনবেদ অনুসরণ করিয়াই ভারতে দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে।

আচার্য্য শঙ্করের জীবনকথার সঙ্গে পদ্মপাদের অতুলনীয় গুরুভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এমন অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা জগতে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শঙ্করাচার্য্য পদ্মপাদের উপর অধিক অনুরক্ত দেখিয়া শিষ্যগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের চৈতন্যসঞ্চারের জন্য একদিন পদ্মপাদকে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। নদীতে তখন নৌকা

ছিল না। গুরুবাক্যে নিঃসংশয় প্রত্যয় করিয়া পদ্মপাদ নদীতে অবতরণ করিলেন। সকলেই বিস্ময়-নেত্রে দেখিল —পদ্মপাদের প্রতি পদক্ষেপে পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। এই ঘটনার পর পদ্মপাদের উপর আর কেহই ঈর্ষ্যান্বিত হয় নাই।

শঙ্করাচার্য্য যখন ভারতের সকল শ্রেণীর সাধক ও পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া বেদান্তের ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন, তখন একজন প্রচ্ছন্ন কাপালিক শঙ্করের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করে। পদ্মপাদ উহার আচরণ সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন। এই ব্যক্তি গোপনে শঙ্করাচার্য্যকে নিজের নিগূঢ় অভিমত ব্যক্ত করে; তার সিদ্ধির জন্য শঙ্করের জীবন ভিক্ষা করিয়া বলে, যে তিনি যদি দধীচির মত, জীমূতবাহনের মত, পরোপকারে প্রাণ বলি দেন, তবে জগতে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। আচার্য্য এই ব্যক্তির উপকারের জন্যই নশ্বর তনু-ত্যাগে দ্বিধা করেন নাই, গোপনেই তার সঙ্গে নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হন। সেই ব্যক্তি শাণিত কুঠার বাহির করিলে, আচার্য্য বলিলেন, "আমি যখন সমাধিমগ্ন হইব, তখন আমায় হত্যা করিও। ইত্যবসরে তোমার পূজাদি সারিয়া লও।"

পদ্মপাদ গুরুর অদর্শনে গুরুতর রূপে চিন্তিত হইয়া পড়েন; সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিষ্যটীর অনুপস্থিতিতে তাঁর

চিত্ত আরও বিচলিত হয়। উৎকণ্ঠায় ও দুশ্চিন্তায় একপ্রকার অভিভূত হইলে, চিত্তে শঙ্করের বর্ত্তমান অবস্থা চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল ; তখন তিনি সিংহদেবের নিকট আচার্য্যের প্রাণভিক্ষার জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁর শরীরে বিদ্যুৎস্রোতঃ বহিল। ভীম উত্তেজনায় ভূমি হইতে উঠিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ পদ্মপাদের এইরূপ ভাবান্তর দর্শনে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

পদ্মপাদের মধ্যে স্বয়ং নৃসিংহদেব তখন আবির্ভূত হইয়াছেন। উদ্দাম নৃত্যে তিনি দেবীর হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া দুরাচারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ; রুধিরলিপ্ত শরীরে আচার্য্যকে ঘিরিয়া প্রচণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; পদ্মপাদের জ্যোতির্ম্ময় শরীর দেখিয়া বুঝিলেন— নৃসিংহদেব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। তিনি নৃসিংহ-স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন, পদ্মপাদ মূর্চ্ছিত হইলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে আচার্য্যকে নিরাপদ্ দেখিয়া পদ্মপাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না ; কিন্তু শঙ্কর রুষ্টভাবে বলিলেন, "তুমি আজ গর্হিত কাজ করিয়াছ। একটা নশ্বর শরীরের জন্য নরহত্যায় নিজেকে কলুষিত করিয়াছ। মায়াবাদীর পক্ষে এ ত্রুটি মার্জ্জনীয় নহে।"

পদ্মপাদ করজোড়ে বলিলেন, "যে দেহকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং শঙ্কর জগতে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ, সে দেহ কাপালিকের খড়্গে বিনষ্ট হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই; এই অপরাধে যদি আমায় অনন্ত কোটী বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ।"

শঙ্কর বলিলেন, "সন্ন্যাসী মায়ামুক্ত—মায়াদেহের উপর এত মমতা সন্ন্যাস-ধর্ম্মে ব্যাভিচার—সত্যই তুমি অপরাধী। পরহিতে প্রাণদানে কেন তুমি বাদ সাধিলে?"

পদ্মপাদ অধিকতর বিনয়পূর্ণ বচনে বলিলেন—"প্রভো! যে দেহ আজও পানাহার না হইলে রক্ষা পায় না, যে দেহের জন্য আজও আহারের চেষ্টা করিতে হয়, সেই দেহ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাহার দ্বারা যদি পৃথিবীর অধিক উপকার সাধিত হয়, তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া আমার বিশ্বাস; আপনার দিকে আজ সমগ্র দেশ মুক্তির আশায় চাহিয়া আছে, সে আশা পূর্ণ হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

আচার্য্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ভ্রান্ত, জান না কি মাত্র ষোড়ষবর্ষ আয়ুঃ লইয়া আমার জন্ম! কাল পূর্ণ হইলে, স্বয়ং ব্যাসদেব আমায় তাঁর কাজেই আরও আয়ুঃ দান করেন; তাই বাঁচিয়া আছি। আজও তাঁর কাজেই জীবন দিতে আহ্বান আসিয়াছিল, তুমি কেন সে

ঈশ্বরবিধান লঙ্ঘন করিলে?" পদ্মপাদের উত্তর ছিল; কিন্তু গুরুবাক্য শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। মনে হইল, "প্রভো, আমার ঈশ্বরবিধান—আপনার পায়ে যেন কুশাঙ্কুর না বিঁধে, আমি তা' পালন করিয়াছি।" কিন্তু মর্ম্মকথা মর্ম্মেই রহিল; পদ্মপাদ আজ যেন অপরাধীর মতই মাথা নত করিয়া রহিলেন।

তারপর কামরূপে শঙ্কর যখন বেদান্ত-প্রচারে উপনীত হন, তখন অভিনব গুপ্ত তন্ত্র-ধর্ম্ম লুপ্ত হয়—এই আতঙ্কে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৌশলে অভিচার-প্রয়োগে তাঁর শরীরে দারুণ ভগন্দর রোগ সঞ্চারিত করিয়া দেন। আচার্য্য রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলে, পদ্মপাদ তাহা দূর করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন; পরিশেষে, যোগবলে গুরুর শরীর হইতে এই দারুণ ব্যাধি অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রেরণ করিয়া রোগমুক্ত করেন। অভিনব গুপ্ত এই রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করেন। শঙ্কর ইহা জানিতে পারিলে, পদ্মপাদকে তিরস্কার করেন। পদ্মপাদ সজল চক্ষে সে দিনও আত্মাপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এমন বিনয়, এমন আনুগত্য, এত প্রেম ছিল বলিয়াই পদ্মপাদ শঙ্করের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছিলেন।

শঙ্করের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল; তিনি মুখে মাতৃদুগ্ধের আস্বাদ পাইয়া জননীর অন্তিমকাল বুঝিয়া

কেরলে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়েরা তাঁহার জননীর শবদেহ স্থানান্তরিত করিতে অগ্রসর হইল না; শঙ্কর-জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে সম্পন্ন হইল। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অভিশাপ দিলেন—তাহাদের গৃহে যতি আতিথ্য গ্রহণ করিবে না, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ গৃহ-প্রাঙ্গণে দগ্ধ হইবে, বেদে তাহাদের অধিকার থাকিবে না। রাজার কাণে এই ঘটনা পৌঁছিলে, তিনি শঙ্করের আত্মীয়দের এই অমানুষিক আচারের দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন। শঙ্কর বলিলেন, "মহারাজ, অন্য দণ্ডের প্রয়োজন নাই, আমার অভিশাপ যাহাতে উহারা ভোগ করে, সেই ব্যবস্থা হইলেই আমি প্রসন্ন হইব।" তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায়, শঙ্কর তাহাদিগকে পাপমুক্ত করেন।

আচার্য্য শঙ্কর ভারতের কাপালিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পবিত্র বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক—চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধবাদের ভিত্তি উপড়াইয়া তিনি ভারতে বেদবিহিত হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতাকা প্রোথিত করেন। বহু বৌদ্ধ, দিগম্বর, জৈন ও পূর্ব্বমীমাংসকগণ শঙ্করের শিষ্য হইয়া তাঁর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন।

কাশ্মীরের সারদাপীঠে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন—উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম দ্বার মুক্ত ; সারা ভারতে এমন কেহ আজও জন্মায় নাই, যিনি মন্দিরের দক্ষিণ দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। বহুযুগ এই দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কে পরাস্ত করিয়া আত্মমতের বিজয়ভেরী বাজাইয়া সারদাপীঠের দক্ষিণ পথ খুলিয়া দিলেন। মণ্ডপে উপনীত হইবামাত্র দৈববাণী হইল—"তুমি বিশ্বজয়ী পণ্ডিত, কিন্তু দেহ তোমার কলুষিত, এ মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই।" শঙ্কর তখন বলিলেন, "আমার এ দেহ নিষ্পাপ—পূর্ব্বজন্মের শরীরে কলুষ-স্পর্শ ঘটিলে, এই শরীর কেন কলুষিত হইবে ?" দৈববাণী স্তব্ধ হইল। শঙ্কর সারদাপীঠে নিজ মতের জয়চ্ছত্র উড়াইলেন।

ভারতের দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর ৩২ বৎসর বয়সে বদরিকায় তনু ত্যাগ করিয়া শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। প্রবাদ—বিদেহ আত্মা যখন কৈলাস-ভবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত, শিবদূতগণ বলিলেন, "তোমার প্রবেশাধিকার নাই ; ভারতে এমন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ, যাহা আজ নররক্তে দেশ ভাসাইয়া দিতেছে।" সত্যই শঙ্করের তিরোধানের পর হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। শঙ্কর উত্তর দিলেন—"যাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, ইহার জন্য তিনিই দায়ী—আমি কি

তাঁর দানই মাথায় বহিয়া জন্মগ্রহণ করি নাই ?" শঙ্করের সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ভাবের পরিচয় পাইয়া, শিবদূতগণ মহা-সমারোহে তাঁহাকে শিবময় করিয়া লইলেন।

আচার্য্য শঙ্কর ভারতের চারি কোণে চারিটী বেদান্তের দুর্গ স্থাপনা করেন—শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গেরী, দ্বারকায় সারদা, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন ও বদরিকায় যোশী মঠ।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠা পাইল। লক্ষ্মণাচার্য্য, হস্তামলক—ইঁহারা আবার বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। দিবাকর আচার্য্য সৌর, ত্রিপুরকুমার শাক্ত, গিরিজাপুত্র গাণপত্য ও বটুকনাথ ভৈরব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বহু বাদের মধ্যেই সার্থক রূপে ফুটিয়া ভারতের ধর্ম্ম-সমন্বয়ে সহায়তা করিয়াছে।

পদ্মপাদ হইতে তীর্থ ও আশ্রম, হস্তামলক হইতে বন ও অরণ্য, মণ্ডন হইতে গিরি, পর্ব্বত ও সাগর, তোটক হইতে সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই দশবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্ট হইল।

যাঁহারা তীর্থ, তাঁহারা বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' লক্ষণযুক্ত তত্ত্ব-ভাবে স্নাত ; বন—সকল কামনার বর্জ্জনে বিশুদ্ধ-নির্ঝর-সন্নিহিত বনবাসী ; আশ্রম—জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত, আশ্রমগ্রহণের উপযোগী সদাচারী, সত্য-ব্রতী ; অরণ্য—অরণ্যেই যাঁহাদের আনন্দ, অরণ্য-ব্রতই যাঁদের জীবন-

ব্রত, চির অরণ্যবাসী ; গিরি—অবিচলিতবুদ্ধি, গম্ভীর, গীতাভ্যাসরত গুহাবাসী ; পর্ব্বত—পর্ব্বতমূলে অবস্থান করিয়া ধ্যানধারণায় ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁহাদের লক্ষ্য ; সাগর—সাগরের ন্যায় গভীর, ফলমূল, ধনরত্ন ব্যতীত অন্য দানে বিতৃষ্ণ, মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে বিরত, আত্মস্থ ; সরস্বতী—কণ্ঠে ঋক্, স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, সংসার-সাগর মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী স্বরবাদী ; ভারতী—বিদ্যাভরণে ভূষিত, দুঃখভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুক্ত সচ্ছন্দ, বিদ্যায় যাঁহাদের আনন্দ।

অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত, এই ত্রিবিধ সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়। শৃঙ্গেরী মঠে পুরী, ভারতী, সরস্বতীর স্থান, সারদা-মঠে তীর্থ ও আশ্রম, গোবর্দ্ধনে বন ও অরণ্য, যোশীতে গিরি, পর্ব্বত ও সাগর-পন্থী অবস্থান করেন।

ভারতের সন্ন্যাসবাদের এই অপার্থিব শ্রেণীবিভাগ করিয়া জগৎকে মহামায়ার কুহক হইতে মুক্তি দিতে ভারতের চতুর্দ্দিকে এই যে গৈরিক পতাকা উড়িয়াছে, তাহা ধূলি-মলিন হইবে না। অদ্বৈত বেদান্ত-সাধনার এই দুর্জ্জয় দুর্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী জড়বাদের আক্রমণে আজও অটল—চিরদিন স্থির হইয়া অভ্রভেদী হিমালয়ের মত জীবকে পরমার্থের সঙ্কেত দিবে। ভারতের শঙ্কর তাই অমর।

* *
*

রামানুজ

শঙ্করের অসমাপ্ত কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও ইহারা মূলতঃ ভিন্ন নহে, ক্রমবিকাশমান এক তত্ত্বেরই অভিব্যক্তি।

শঙ্কর বৌদ্ধশূন্যবাদ উড়াইয়া, অদ্বৈতবাদের পথে ভারতকে আনয়ন করেন। বৌদ্ধযুগের হীনযান, বজ্রযান, উভয় সম্প্রদায় জীব ও আত্মা এই অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়া বিচিত্র সাধননীতির প্রবর্ত্তন করেন; তত্ত্বানুসন্ধান চাপা পড়িয়া সাধনপ্রণালী মুখ্যস্থান অধিকার করে; বৌদ্ধ-সাধনার পরিণতি বীরাচার, কুলাচার প্রভৃতি তন্ত্র-সাধনায় দেহ বিচার করিতে গিয়া ষড়রিপুর সেবা সাধনার অঙ্গ হইয়া উঠে; জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের ত্রিধারা লুপ্ত হইয়া যায়—ভারতে সে এক প্রকার নাস্তিকতার যুগ। বৌদ্ধযুগের অধঃপতন যখন চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তখনই শঙ্করাচার্য্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিগূঢ় সন্ধান দিয়া জাতিকে

প্রকৃতিস্থ করেন ; তাঁহার অদ্বৈতবাদ জ্ঞান ও ভক্তির রুদ্ধ উৎস মুক্ত করিয়া দেয়, ভারতে আস্তিক্য-ধর্ম্মের-পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু তিনি ব্যবহার ও পরমার্থে সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই, অথবা সে যুগে ইহা সম্ভব ছিল না। তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞান-প্রধান সাধনারই দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। শঙ্করের দর্শনে মায়াবাদের কুজ্ঝটিকা ভারতের জীবন ছায়াচ্ছন্ন করিল; অসমর্থ জীবের জন্য কর্ম্ম, এই যুক্তি দিয়া তিনি অধিকারী অনধিকারীর ভেদ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল। অনধিকারী হওয়ার যে লঘুতা, তাহা কেহ সহিতে রাজী হয় নাই। কাজেই জ্ঞানকাণ্ডের পথেই জাতি অগ্রসর হইয়াছিল। যদিও শঙ্করের সন্ন্যাস যাহার তাহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, ধাপের পর ধাপ কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়াই উঠিতে হইত, কিন্তু স্রোতঃ যখন বহে, তখন আর বিচার রক্ষা সম্ভব হয় না—ভারতের কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। জননমরণাদি সংসারানলসন্তপ্ত দীপ্ত-শিরা শ্রোত্রিয় নির্গতকলুষ হইয়া বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়াইল না, অত্যন্ত অনধিকারীর কণ্ঠেই রোল উঠিল—"অহং ব্রহ্মাস্মি।" প্রকৃতির পীড়ন তাহাতে ঘুচিল না। বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের অপেক্ষা শঙ্করযুগের পতন তাই

তুলনায় কম নহে। শঙ্করের ধর্ম্ম অসমর্থ জীবের হাতে পড়িয়া পরবর্ত্তী যুগে নিরতিশয় দুর্গতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ প্রভাবকে গ্রাস করিতেই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কতকটা প্রভাবহীন হইয়া পড়ে। ইহার পর ইহা আরও ম্লান মূর্ত্তি ধরিল। জীবের হৃদয় যে অমৃতপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ করিলেন আচার্য্য রামানুজ —সমুজ্জ্বল, সুনির্ম্মল, জ্ঞানভক্তিমিশ্রিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারে। দাবদগ্ধ মরু-হৃদয় সান্ত্বনা পাইল, অমৃতসিঞ্চনে শীতল হইল।

ভারতের বৈদিক ধর্ম্মের বেদী বৌদ্ধযুগের ভীমাবর্ত্ত হইতে শঙ্করাচার্য্য উদ্ধার করিলেন—রামানুজের মন্ত্র-প্রভাবে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। বৈদিক ভারত পুনঃ উন্নত শিরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভারতের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাস পারম্পর্য্যরহিত নহে। কুরুক্ষেত্রে ভারত যে ধর্ম্ম-বীজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত করার জন্য যুগে যুগে যুগ-গুরুগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের নববেদ বিজয়ী রাজন্যবৃন্দ জীবনগত করেন নাই, আত্মীয়-স্বজন হনন করিয়া যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা পাইল, তাহা ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ হয় নাই। স্বয়ং পার্থ শোকার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেন, গীতার বাণী

সফল করার জন্য তিনিও দাঁড়াইয়া থাকেন নাই—ভারত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের বেদ জাতি মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। যে অশুদ্ধিবশতঃ চিরযুগের যোগধর্ম্ম জীবের অন্তরে ঠাঁই পায় নাই, সেই অশুদ্ধির হিমালয়-স্তূপে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি সংযোগ করেন। কুরুক্ষেত্রে রাজস্ ক্ষাত্রশক্তি নিঃশেষ হইয়াছিল, তাহা একান্ত জড় বস্তু; বৌদ্ধযুগে ইহারই সূক্ষ্মাংশ পুড়িয়া ছাই হইল। অশ্বমেধ, গোমেধ, রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইয়াছিল; বৌদ্ধবাদে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্র, যাগ, পুণ্য হোম-কুণ্ড নির্ব্বাপিত হইল—ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতি নিরালম্ব হইয়া প্রত্যক্ষ আত্ম-জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিল।

কিন্তু প্রকৃতির কষাঘাতে সে আত্মদর্শনের পুণ্য জ্যোতির্ম্ময় শিখাও ম্লান হইয়া পড়িল। শুষ্ক নিরীশ্বর-নীতি প্রচারিত হওয়ার প্রচেষ্টা মানুষের ধর্ম্মজীবনের বস্তু হইয়া উঠিল ; ইহার ফলেই বৌদ্ধসাধকগণ প্রকৃতির হাতে পরাজিত হইলেন—ধর্ম্মের ছদ্মবেশে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিল। সে অন্তর্প্রবাহী কলুষধারার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—আচার্য্য শঙ্কর। প্রেম-ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দেওয়া তখন সহজ ছিল না—জ্ঞানের আবরণে প্রেম-ভক্তির বীজই আচার্য্য জাতিকে উপহার দিয়াছিলেন। রামানুজ সেই বীজেরই অঙ্কুরস্বরূপ। তারপর

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অবাধে ভারতে বৃন্দাবন সৃজন করার ধারাবাহিক প্রয়াস করিয়াছেন।

একেবারে শূন্যবাদ হইতে কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই ভারতের ভগবান বিগ্রহ-রূপে কোথাও সন্তান, কোথাও জননী প্রভৃতি জীবের সহিত মধুময় সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া শুষ্ক হিয়াকে শীতল করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার চরম প্রকাশ নবদ্বীপে। দ্বিভুজ মুরলীধর মনুষ্যমূর্ত্তিতে ভগবানের অস্তিত্ব-স্বীকারে মর্ত্ত্যকে ব্রহ্মমূর্ত্তি করিয়া তোলার অসাধারণ তপস্যা প্রকাশ পাইয়াছিল।

জ্ঞান ফল্গুধারার মত অন্তর্বাহী ; ভক্তি শতদলপদ্মের মত জীবনকে সৌরভময় করিয়া মর্ত্ত্যে বৃন্দাবনসৃজন সম্ভব করে। ত্রিমার্গ-সাধনায় যুগ যুগ ভারত সিদ্ধির জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছে, পূর্ণ ভাগবত জীবনের সন্ধান আজিও সে পায় নাই।

ভক্তি-সাধনায় ভারতকে দীক্ষা দিবার জন্য শঙ্করাবির্ভাবের পূর্ব্বেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু রামানুজের আবির্ভাব-কাল হইতেই এই সম্প্রদায় প্রবল হইয়া ভারতে ভক্তির গঙ্গোত্রীধারা বহিয়া আনে। এই সম্প্রদায় প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত—শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য—এই চারি জন মহাপুরুষ এই চারি সম্প্রদায়ের অগ্রণী। কথিত আছে—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্যাচার্য্যঞ্চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণু-স্বামীকে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন।

লক্ষ্মী রামানুজকে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম শ্রী-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে জন্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন—তাঁহার জন্মকাল ১০১৭ খৃষ্টাব্দ। ইহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতা শান্তিমতী।

রামানুজের বাল্যকালেই অন্তরে ভক্তির উদয় হয়। কাঞ্চী ও পুণামেলি নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাঁর জন্মস্থান ছিল, উহার নাম পেরমবুদুর। পুণামেলি হইতে কাঞ্চী-নগরের দেবমন্দিরে কাঞ্চীপূর্ণ নামে একজন ভক্ত নিয়ত যাতায়াত করিতেন; তাঁহার মিষ্টস্বভাব ও সদাচার দেখিয়া শৈশবকাল হইতেই রামানুজ তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্তরে এই শ্রদ্ধাভক্তির উৎস ক্রমে প্রবল হইয়া বিস্তৃত মূর্ত্তিতে ভারতকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

রামানুজের বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহাকে অধ্যয়নের জন্য বিখ্যাত যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যাদব-

প্রকাশ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিগ্রহমূর্ত্তি স্বীকার করিতেন না; কিন্তু জগৎকে মায়া বলিয়াও উড়াইয়া দিতেন না। জগৎ ঈশ্বরের বিরাট্‌ মূর্ত্তি; যদিও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তবুও ইহা তাঁর নিত্যরূপ—ইহাই ছিল তাঁর যুক্তি। এই জগতের পশ্চাতে যে স্বরাট্‌ সত্তা, তাহাই ব্রহ্ম, আর এই প্রকাশমান জগৎ জীব-রূপী আত্মা।

রামানুজের জ্ঞানবিকাশের সঙ্গেই এই শুদ্ধাদ্বৈত-বাদে তাঁর হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না, তিনি ঈশ্বরের বিগ্রহ-মূর্ত্তির অনুরাগী হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যাদবপ্রকাশের অখণ্ড যুক্তির সম্মুখে তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না।

একদিন আত্মমত প্রকাশ করিয়া বলার সুযোগ ঘটিল এবং এই ঘটনাই রামানুজের ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আচার্য্য তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে "কপ্যাসং" অর্থে বানরের অপান দেশ বুঝাইয়া দিলেন। রামানুজ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—শ্রীভগবানের নয়ন-পদ্মের সহিত বানরের অপান দেশের বড় গর্হিত তুলনা, ইহা কখনই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিমত নহে। যাদবপ্রকাশ রামানুজের এইরূপ প্রতিবাদে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—'তুমি যদি ইহার কোন সদর্থ করিতে পার, আপত্তি নাই।' তখন রামানুজ অসীম প্রতিভাবলে বলিলেন—'তথা যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব মক্ষিণী'—এই স্থানে অস্‌ ধাতু ঘঞ্‌ করিয়া আস হইয়াছে, আস অর্থে

বিকসিত ; অতঃপর, কং জলং পিবতীতি কপিঃ অর্থাৎ সূর্য্য এই লক্ষণা ধরিয়া, ইহার অর্থ—উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় ভগবানের নয়নপদ্মের তুলনা হইতে পারে।” যাদব-প্রকাশ রামানুজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ; কিন্তু শিষ্যগণের সম্মুখে নিজের এইরূপ পরাজয়ে তাহার উপর ভিতরে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“হইতে পারে, কিন্তু ইহা গৌণার্থ ; মুখ্য অর্থে আমার ব্যাখ্যাই প্রশস্ত”—এইরূপে আত্মমর্য্যাদা সে যাত্রা রক্ষা করিলেন।

ইহা হইতে রামানুজের ভরসা বাড়িয়া গেল। আর এক দিন তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পড়াইতে গিয়া যাদবপ্রকাশ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইহার অর্থ করিলেন—“ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ।” রামানুজ বলিলেন—“হইতে পারে না ; সত্য, জ্ঞান, এইগুলি ব্রহ্মের গুণ, স্বরূপ নহে। যেমন দেহ আমার, কিন্তু আমি দেহ নহি ; ব্রহ্মের যাহা ধর্ম্ম, তাহা তিনি হইতে পারেন না, তিনি ইহা হইতে অতীত, স্বতন্ত্র।” যাদবাচার্য্য এইবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন “তোমার অর্থ মহাত্মা শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র, কোনও পূর্ব্বাচার্য্যের সহিত এক নহে ; অতএব এইরূপ কদর্থ করিয়া পূর্ব্বগুরুগণের অপমান করিও না, তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি।” রামানুজ ইহার:পর আচার্য্যের সম্মুখে তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার

আর প্রতিবাদ করিলেন না; কিন্তু যাদবাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা তাঁহার মনঃপুত হইত না। তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইহা লইয়া এক বিস্তৃত রচনা বাহির করিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত হইলেন; যাদবপ্রকাশও যেন এই বালকের প্রতিভার নিকট নিজেকে ম্লান মনে করিলেন। তিনি শিষ্যের এইরূপ পাণ্ডিত্য সহ্য করিতে পারিলেন না, ঈর্ষ্যায় কাতর হইয়া অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামানুজের প্রাণসংহার করিতে মনঃস্থ করিলেন।

যাদবাচার্য্য এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া, শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন, রামানুজ হৃষ্টচিত্তে গুরুর অনুসরণ করিলেন।

যখন তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তাভিমুখে যাত্রা করিয়া, বিন্ধ্যাচল-পাদবর্ত্তী ভীষণ গোণ্ডারণ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন যাদবাচার্য্য তাঁহার দুষ্টাভিলাষ পূর্ণ করার যোগ্য স্থান স্থির করিয়া শিষ্যগণকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। যাদবাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে রামানুজের এক জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন; তাঁর নাম গোবিন্দ। ভবিষ্যতে ইঁনিও রামানুজ-সম্প্রদায়ের একজন অগ্রণী হইয়াছিলেন। ভ্রাতাকে গোপনে ডাকিয়া, গুরুর এই ভীষণ অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে সত্বর স্থান ত্যাগ করিতে

বলিলেন। রামানুজ এই নৃশংস চক্রান্তের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কন্তু গোবিন্দকে তিনি প্রাণের অধিক স্নেহ করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন—কাজেই ইহা অপ্রত্যয় না করিয়া অতি দ্রুত গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন। গোবিন্দ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গুরুর নিকট জ্ঞাপন করিল, যে রামানুজকে হিংস্র ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে, দৈব রক্ষা না করিলে সেও বাঁচিত না—এই বলিয়া আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল। যাদবাচার্য্য অন্তরে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গোবিন্দকে প্রবোধ দিলেন এবং শীঘ্র বিন্ধ্যারণ্য ভেদ করিয়া বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সারাদিন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। এই সময়ে এক ব্যাধ-দম্পতি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া কাঞ্চীনগরে পৌঁছাইয়া দেয়; তিনি সহসা বিন্ধ্যাচলের অরণ্যরাজি ভেদ করিয়া কেমন করিয়া কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, নগরের উপকণ্ঠে পৌঁছিবামাত্র ব্যাধ-দম্পতি অদৃশ্য হইলেন, তখন বুঝিলেন—উহা দেবতার কৃপা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই স্থানে মাতৃদর্শন ঘটিলে, তিনি সকল কথা জননীকে বলিলেন; জননী শুনিয়া সন্তানকে স্নেহভরে বুকে লইয়া চুম্বন করিলেন। এই কথা যাহাতে গোপন থাকে,

এইরূপ কহিয়া রামানুজ মাতৃসদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে যাদবাচার্য্য গঙ্গাস্নানান্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানুজকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তবে যখন দেখিলেন—তাঁহার ষড়যন্ত্রের কথা রামানুজ জানিতে পারে নাই, তখন উৎকণ্ঠার কোন কারণ রহিল না। রামানুজও নিঃশঙ্কচিত্তে আচার্য্যের নিকট পুনরায় অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদরাজ নামে এক প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ছিল। শ্রীরঙ্গমের মঠাধ্যক্ষ যামুন মুনি বিগ্রহদর্শনে উপস্থিত হইয়া রামানুজকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার অন্তর অপার্থিব স্নেহ ও প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন শুনিলেন—এই যুবা পুরুষই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের" নূতন ব্যাখ্যা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু রামানুজ যাদবাচার্য্যের শিষ্য এই কথা শুনিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন; কেননা, যাদবাচার্য্য বিগ্রহমূর্ত্তির উপাসনানীতির ঘোরতর বিরুদ্ধ ছিলেন। যামুন মুনি নিরাশ হইয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানুজের অন্তরও যামুন মুনির প্রশান্ত নয়নের স্নেহ-দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

যামুন মুনি তৎকালে দক্ষিণাপথে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন; ইঁহার সহিত মিলিত হওয়ার আশা তাঁহার দুরাশা বলিয়া মনে হইল। তিনি যথারীতি যাদবাচার্য্যের নিকট নিয়মিত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা উপলক্ষ করিয়া রামানুজের নাম সমগ্র কাঞ্চীনগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কাঞ্চীরাজকুমারী ব্রহ্ম-রাক্ষসগ্রস্ত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই কুমারীকে রোগমুক্ত করিতে পারিল না। যাদবপ্রকাশ বেদান্তশাস্ত্র ব্যতীত মন্ত্রশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন; ভূত-প্রেত-পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি অনায়াসেই রোগমুক্ত করিতেন। রাজাদেশে যাদবপ্রকাশ রাজপ্রাসাদে আনীত হইলেন; কিন্তু কোন ফলই হইল না। ব্রহ্মরাক্ষস বরং কর্কশ স্বরে বলিল—"রামানুজের পদস্পর্শ পাইলে আমি যাইতে পারি।" যাদবপ্রকাশ নিরুপায় হইয়া রামানুজকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম-রাক্ষসের নির্দ্দেশ-মত রামানুজকে রাজকুমারীর মস্তকে পদস্পর্শ করিতে আদেশ করিলেন। রামানুজ গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবামাত্র ব্রহ্ম-রাক্ষস সম্মুখস্থ বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া রাজকুমারীর শরীর ত্যাগ করিল। রামানুজের প্রতি কাঞ্চীনগরের আবালবৃদ্ধবণিতা এই ঘটনায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পড়িল। যাদবপ্রকাশ অন্তরে অন্তরে ভয়ঙ্কর

ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। চোলরাজ্যে এমন ব্যক্তি রহিল না, যাহার মুখে রামানুজের গুণকীর্ত্তন না হইল। যাদবপ্রকাশের ইহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

এই ঘটনার পর অধ্যয়ন-কালে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এই সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া গোল বাধিল। যাদবাচার্য্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দীপ্ত দিবাকরের মত বসিয়া যখন এই সূত্রের প্রাঞ্জল অর্থ প্রকাশ করিতেছিলেন, রামানুজ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনার অর্থ সঙ্গত হইতেছে না। আপনি নিখিল জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিতেছেন, কিন্তু উহার পরেই কহিয়াছেন 'তজ্জলান্।' আপনার উক্তি সত্য ব্যাখ্যা হইলে, এই 'তজ্জলান্' শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্মদ্বারা সঞ্জীবিত, ব্রহ্মেই লয় পাইবে নিশ্চয়—তাই বলিয়া জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইবে কেন? মীনের জন্ম জলে, জলেই জীবন ধারণ করে ও জলে লয় পায় বলিয়া মীনকে কি জলস্বরূপ বলা বিধেয়? তারপর 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—ইহার অর্থ 'একাধিক কোন বস্তু নাই,' ইহা নহে; ব্রহ্ম-সূত্র এক অনন্ত, বহু এই একে সংযুক্ত—তাই একাকারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই সূত্রে বহুত্বের হানি হয় নাই; বরং বিচিত্র বস্তুর পৃথকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।"

যাদবাচার্য্য আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধ-কম্পিত বচনে বলিলেন—"দূর হও মূর্খ, আমার অর্থ যদি তোমার সঙ্গত মনে না হয়, অধ্যয়ন করিতে আর আসিও না।"—এই বলিয়া তিনি রামানুজের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলেন। রামানুজের অন্তরে যামুন মুনির আকর্ষণ তখন অঙ্কুরিত ; তিনি ইহা বিধাতার বিধান বলিয়াই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন এবং "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য" এই বলিয়া যাদবপ্রকাশের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যামুন মুনি অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের সভাপণ্ডিত কোলাহলাচার্য্যকে কূটতর্কে পরাজিত করিয়া অর্দ্ধরাজ্য লাভ করেন। পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তুচ্ছ রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ কাবেরী ও কোল্লিডম নদীর মধ্যবর্ত্তী সপ্ত প্রাকার-বেষ্টিত শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া তিনি বিগ্রহমূর্ত্তির সেবায় আত্মদান করেন। তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, বিগ্রহমূর্ত্তির সহিত তাঁহাকে অভেদ-জ্ঞানে লোকেরা পূজা করিত।

যামুন মুনির অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, তদীয় শিষ্যেরা শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কে এইরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠায় দেববিগ্রহের

মহিমা অক্ষুণ্ন রাখিবে? অনেকেই শ্রীগুরুর সহিত আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যামুন মুনি তাঁহাদিগকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের বিগ্রহের ন্যায়, তিরুপতিস্থ বালাজী ও কাঞ্চীপুরস্থ বরদরাজ প্রসিদ্ধ ছিলেন। "শ্রীরঙ্গম নারায়ণের ধাম, তিরুপতি নারায়ণের পাদপদ্ম-প্রাপক শ্লোক ও কাঞ্চীপুর তারক মন্ত্র।" যামুন মুনি শিষ্যগণকে এই তিন বিগ্রহের দর্শন ও পূজায় শোকভার লাঘব করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু যামুন মুনি দেহরক্ষা করিবেন, তাঁর জাগ্রত জীবনের পুণ্য প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাঁহাদের যে দুর্গতির সীমা থাকিবে না, ইহা ভাবিয়া সকলেই বিষণ্ণ হইলেন।

যামুন মুনি রামানুজকে দেখিয়া অবধি তিনি যে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উপযুক্ত সেবক, ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিকে রামানুজ সংসারী, অন্যদিকে নাস্তিক যাদবপ্রকাশের শিষ্য হওয়ায়, তিনি একপ্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু তত্রাপি স্তোত্ররত্নপাঠ করিয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের চরণে তিনি নিত্য রামানুজকে স্মরণ করিতেন। এই অধ্যাত্ম আকর্ষণ রামানুজের জীবনেও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাদবাচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন—শুষ্ক শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁর অন্তর আর তৃপ্ত হইতেছিল না,

এইরূপ সময়ে শ্রীবরদরাজের সেবক শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ তাঁর নিকট উপনীত হইলেন। রামানুজ পরমানন্দে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহাত্মন্! আচার্য্য যাদবপ্রকাশ আমায় চরণাশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আমি আজ নিরাশ্রয়; আপনার শীতল চরণে স্থান দিন, আমায় দীক্ষা দিন, আমায় শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করুন।"

পরমভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি-দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, মহাপণ্ডিত; আমি শূদ্র, মূর্খ, শ্রীবরদরাজের অধমভৃত্য। তুমি গুরু, আমি শিষ্য। তোমার এবম্বিধ দীনতায় আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। বৎস, তোমার এই অকৃত্রিম ভক্তি কিন্তু আমায় পাগল করিয়াছে। আজ হইতে শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনার জন্য শালকূপের পবিত্র জল আনয়ন করিও, হস্তীগিরিপতি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন।"

পরমভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের এই আদেশ-বাক্য দীক্ষামন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া, ভবিষ্য জীবনের জন্য রামানুজ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শালকূপ হইতে নূতন কলস করিয়া শ্রীবরদরাজের সেবায় জল যোগান দিতে লাগিলেন ও কাঞ্চীপূর্ণের সংসর্গে তাঁর অন্তরে ভক্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিল।

যামুন মুনি রোগশয্যায় পড়িয়া রামানুজের যাদবাচার্য্যের সহিত সংস্রবত্যাগের কথা ও শ্রীবরদরাজের

সেবাব্রতে দীক্ষার কথা কর্ণগোচর করিলেন, মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "কে আছ, রামানুজকে আনয়ন কর। ভগবান তাঁর অন্তরে নিত্য বিরাজমান; তিনি আমাদেরই একজন—আমার তিরোধানে রামানুজই শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের সেবক হইবে।"

রামানুজের খ্যাতি ইতিমধ্যে দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁর কাঞ্চী-রাজকুমারীকে রোগমুক্ত করার কথাও প্রসিদ্ধ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ব্রহ্মের ব্যাখ্যা ভক্ত-জনের হৃদয়ে আনন্দ বিধান করিয়াছিল। মহাত্মা যামুন মুনির শ্রীমুখে এই বাণী তাঁর অন্তিমবাণী বুঝিয়া শ্রীমহাপূর্ণ কাঞ্চীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চীনগরে আসিয়া শ্রীবরদরাজের মন্দিরে শ্রীকাঞ্চী-পূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমহাপূর্ণের মুখে যামুন মুনির সঙ্কল্প শুনিয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অতিশয় হর্ষান্বিত-কলেবরে শ্রীমহাপূর্ণকে লইয়া অদূরে শালকূপ সন্নিধানে, রামানুজ যেখানে শ্রীশ্রীবরদরাজের অর্চ্চনার জন্য কলসী ভরিয়া জল লইতেছিলেন, তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আপনার মন্তব্য ব্যক্ত করুন, হস্তীগিরিপতি আমাদের এ সাধ পূর্ণ করিবেন।" শ্রীমহাপূর্ণ দেখিলেন—সত্যই দেবকান্তি, অপরূপ দীপ্তিময়, পরম মনোহর যুবাপুরুষ, পূর্ণকুম্ভ স্কন্ধে লইয়া সহাস্য আস্যে তাঁহার দিকে অগ্রসর

হইতেছেন। তিনি দেখিলেন—অদ্বিতীয় বিষ্ণুমূর্ত্তি; হৃদয়ের আবেগ রোধ মানিল না, মুখ দিয়া স্ফুরিত হইল—

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতো দধি॥

ইতিমধ্যে রামানুজ শ্রীমহাপূর্ণের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীমহাপূর্ণ নত-মস্তকে নমস্কার করিয়া উচ্চারণ করিলেন—

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতি ভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈব ভূময়ে।
নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈক সিন্ধবে॥

চিত্রার্পিতের ন্যায় রামানুজ এই মধুগাথা শ্রবণ করিলেন। রামানুজের ঐকান্তিকতা দেখিয়া শ্রীমহাপূর্ণ শ্রীগুরু যামুন মুনির বিরচিত আরও কয়েকটী ভক্তিস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। রামানুজের চক্ষে মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই কষায়-বস্ত্র-পরিহিত, তেজস্বী, পূজনীয় বৃদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সকাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "প্রভো! এরূপ সুললিত ছন্দোময় স্তোত্ররত্নের রচয়িতা কে?" শ্রীমহাপূর্ণ বিনয়সহকারে কহিলেন, "আমারই প্রভু

যামুনমুনি-বিরচিত।" রামানুজের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "শুনিয়াছি—তিনি পীড়িত, এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন কি?" শ্রীমহাপূর্ণ রামানুজের এই প্রেমাকুল প্রশ্নে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরমাত্মীয়-বোধে রামানুজকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন।

শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজ শুনিলেন, তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দুঃখের আর অবধি রহিল না, শ্রীযামুন মুনির মৃতদেহদর্শনে তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। বহু কষ্টে চৈতন্যসম্পাদন হইলে শিরে করাঘাত করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি লক্ষ্য করিলেন—যামুন মুনির তিনটী করাঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—তাঁহার জীবিত অবস্থায় ঐরূপ ছিল না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ঃ—

"অহং বিষ্ণুমতিঃ স্থিত্বা জনান্ জ্ঞানমোহিতান্।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নান্ দ্রাবিড়াম্নায় পারগান্।
প্রপত্তিধর্ম্মনিরতান্ কৃত্বা রক্ষামি সর্ব্বদা।"

'আমি বিষ্ণুমতি থাকিয়া, অজ্ঞানমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড় বেদবিশারদ এবং ধর্ম্মানুগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।'

এই বাণী উচ্চারিত হওয়ামাত্র, একটী অঙ্গুলী ঋজু হইল। রামানুজ আবার কহিলেন ঃ—

"সংগৃহ্য নিখিলানর্থান্ তত্ত্বজ্ঞানপরম্ শুভম্।
শ্রীভাষ্যঞ্চ করিষ্যামি জ্ঞানরক্ষণহেতুনা॥"

'জনরক্ষার হেতু সর্ব্বার্থ সংগ্রহ করিয়া পরম শুভ তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রীভাষ্য প্রণয়ণ করিব।'

দেখিতে দেখিতে যামুন মুনির আর একটী অঙ্গুলী সরল হইল। রামানুজ আবেগকম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"জীবেশ্বরাদীন্ লোকেভ্য কৃপয়াচ পারাশরঃ
সন্দর্শয়ন্ তৎস্বভাবান্ তদুপায় গতীস্তথা।
পুরার্থরত্নম্ সংচক্রে মুনিবর্য্য কৃপানিধিঃ।
তস্য নাম্না মহাপ্রাজ্ঞ বৈষ্ণবস্য চ কস্যচিৎ॥
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি নিষ্ক্রিয়ার্থং মুনেহরম্॥"

'যে কৃপাময় মুনিবর পারাশর লোকের প্রতি দয়াবশতঃ জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাহাদের স্বভাব ও তাহাদের উন্নতি পথ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া পুরাণরত্ন রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঋণশোধ করিবার জন্য আমি কোন এক মহাপণ্ডিত বৈষ্ণবকে তন্নামে অভিহিত করিব।'

জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা দেখিল—রামানুজের এই কথা শেষ হইলে যামুন মুনির

তৃতীয় অঙ্গুলী সহজ হইয়া গেল। তখন সকলেই নিঃসংশয় হইল, যে এই যুবকই কালে আলওয়ারের আসন গ্রহণ করিবেন। রামানুজ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে যামুন মুনির শব সমাধিগর্ভে নিহিত হওয়ার পূর্ব্বেই কাঞ্চীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চীনগরে আসিয়া তাঁহার মন ঘটনার পর ঘটনায় শান্তিহীন হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ, স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করিলেন; তারপর গৃহিণী জমাম্বার আচরণ তাঁহাকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করিতে লাগিল। শ্রীরঙ্গম্ হইতে নৈরাশ্যময় অন্তরে বাটী প্রত্যাগমন করা অবধি তিনি সংসারকাজে অতিশয় উদাসীন হইয়াছিলেন, গৃহিণীর নিকট ইহার জন্য সর্ব্বদাই গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত। তিনি শান্তির আশায় শ্রীবরদরাজের মন্দিরে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের নিকটই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন; শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য আকুলতা দেখাইতেন; কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মত হইতেন না। রামানুজ ভাবিলেন—আমি অনুপযুক্ত ভাবিয়া ইনি দীক্ষা দিতে সম্মত নহেন। নিজের অযোগ্যতা দূর করিবার উপায় ভাবিলেন—কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন; এইজন্য একদিন রামানুজ তাঁহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ইহা বুঝিয়াছিলেন; তাই রামানুজ স্নানার্থে বাটীর বাহির হইলে, তিনি রামানুজ-পত্নী জমাম্বারের

নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "আমার বড় ক্ষুধা, শীঘ্র অন্ন দাও।" জমাম্বা স্বামীর অনুপস্থিতির কথা বলিলেও, তিনি ক্ষুধাতুরের মত কাতর অনুনয়ে রামানুজের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই আহার সমাপ্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। জমাম্বা শূদ্রের অন্নভোজনের পর রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া পুনঃ রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রামানুজ ফিরিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন ও বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। নিজেকে নিতান্ত দীন জ্ঞানে, কাঞ্চী-পূর্ণের চরণবন্দনা করিয়া তিনি বলিলেন "প্রভো! আমি আপনার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নই; তাই বলিয়া কি এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে হয়?" কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎস! গুরু তোমার যথাকালে আসিবেন, ব্যস্ত হইও না।" রামানুজ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন এক শূদ্র দাস অনাহারে শীর্ণ হইয়া রামানুজকে তৈল স্নান করাইতে আসিল, এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা জানাইল। রামানুজ সত্বর জমাম্বাকে পর্য্যুষিত অন্ন দান করিতে অনুমতি দিলেন। জমাম্বা পর্য্যুষিত অন্ন নাই বলিয়া স্নানে বাহির হইলেন। ইত্যবসরে রামানুজ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন —রন্ধনপাত্রে প্রচুর পর্য্যুষিত অন্ন রহিয়াছে; ক্ষুব্ধচিত্তে অনাহারী শূদ্র দাসকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

মনে একবিন্দু শান্তি নাই, নিরন্তর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দিবারাত্রি বক্ষে শিরে করাঘাত করিয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল ; নানারূপ সংশয়চিত্ত হইয়া প্রাণরক্ষা দায়ের কথা হইল। তখন তিনি কাঞ্চীপূর্ণের চরণ ধরিয়া পড়িলেন, বলিলেন "প্রভো, রক্ষা করুন, দীক্ষা দিন, আমায় নিঃসংশয় করুন—আর স্থির থাকিতে পারি না।" কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "শ্রীবরদরাজকে তোমার কথা জানাইব, তিনি যাহা বলিবেন—সেইমত কার্য্য হইবে।"

কথিত আছে, কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শ্রীবরদরাজ কথোপকথন করিতেন। রামানুজের কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীবরদরাজ উত্তর দিলেন—

"অহমেব পরমব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥
মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাম্ জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসনে ভক্তানাং দদামি পরমম্ পদম্।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয়গুণাশ্রয়ম্॥
ইতি রামানুজাচার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্"

(১) আমি জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ পরম ব্রহ্ম। (২) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। (৩) ভগবৎপাদপদ্মে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের আত্মসমর্পণই মুক্তির একমাত্র উপায়। অন্তিমস্মরণে অসমর্থ হইলেও,

আমার ভক্তের মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগেই ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। (৬) সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এই কথা কহিয়াছি—রামানুজকে গিয়া বল।

রামানুজ শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের মুখে শ্রীশ্রীবরদরাজের বাণী শুনিয়া উন্মাদ হইলেন; তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া শ্রীমহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গমের পথে যাত্রা করিলেন। শ্রীরঙ্গমে এক বৎসর যামুন মুনিকে হারাইয়া তদীয় শিষ্যমণ্ডলী হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা যুক্তি করিয়া গুরুর পূর্ব্বনির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীমহাপূর্ণকে রামানুজকে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীমহাপূর্ণ হৃষ্টচিত্তে কাঞ্চীপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাদুরা নগরের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির-সম্মুখস্থিত বৃহৎ-সরোবরতীরে রামানুজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ অধীর হইয়া শ্রীশ্রীবরদরাজের বাণী জ্ঞাপন করিলেন; শ্রীমহাপূর্ণ কহিলেন, "ইহাই ভগবৎ ইচ্ছা—চল কাঞ্চীপুরে, শ্রীশ্রীবরদরাজের সম্মুখে দীক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করি।" রামানুজ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"একমুহূর্ত্ত বিলম্বে প্রাণ রাখা দায় হইয়াছে, মৃত্যুর সময়জ্ঞান কোথা? কত আশা করিয়া যামুন মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, সে আশা বিফল হইয়াছে; সুতরাং বঞ্চনা বুঝা যায় না—আপনি এই মুহূর্ত্তে আমায় মন্ত্র দিন, আমি নবজন্ম লাভ করি।"

রামানুজের আগ্রহ দেখিয়া শ্রীমহাপূর্ণ বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ বৃহৎ সরোবর-তীরে শ্যাম-পত্রযুক্ত বহুশাখাবিশিষ্ট কুসুমিত বকুল-বৃক্ষ-মূলে শঙ্খচক্র-চিহ্নিত দুইটী উত্তপ্ত আয়সী মুদ্রার দ্বারা শ্রৌত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উভয় বাহু চিহ্নিত করিয়া রামানুজের :কর্ণে বিষ্ণু-মন্ত্র প্রদান করিলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, দীক্ষিত রামানুজ গুরু ও গুরু-পত্নীকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে কাঞ্চীপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমহাপূর্ণকে লইয়া রামানুজ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও স্বীয় পত্নীর পঞ্চসংস্কার করাইয়া তাঁহাকেও দীক্ষা দিলেন, পরে গুরু ও গুরুপত্নীকে নিজালয়ে রাখিয়া গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

দীক্ষিত রামানুজ অন্তরে অপার্থিব শান্তি উপলব্ধি করিলেন। গুরু-কর্ত্তৃক যজ্ঞ, অঙ্কন, উদপুণ্ড্র, মন্ত্র ও দাস্য নাম—এই পঞ্চসংস্কারে একেবারেই নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গুরু-সমীপে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় চারি সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করিলেন ও অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য বাজারে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে বাহির হইলেন।

জমাম্বা স্বামীর অত্যধিক ধর্ম্মানুরাগে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহার উপর প্রতিদিন গুরুপত্নীর সেবায় অধীর হইয়া উঠিলেন। আত্ম-গরিমার বশে উভয়ে যখন রন্ধনের জল

আনিতেছিলেন, তখন গুরুপত্নীর কলসের জল জমাম্বার কলসে পতিত হইয়াছিল ; ইহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন, নিজের বংশ-মর্য্যাদার উল্লেখ করিয়া গুরুপত্নীকে নীচ-বংশোদ্ভব বলিয়া গালি দিলেন। শ্রীমহাপূর্ণ স্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব ভগবানের সঙ্কেত স্থান ত্যাগ করা—ইহাই স্থির করিয়া শ্রীরঙ্গনাথে প্রস্থান করিলেন।

রামানুজ যথাসময়ে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া গুরুর অদর্শনে কাতর হইয়া পড়িলেন ও জমাম্বার আচরণে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন ; তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পত্নীকে কৌশলে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া, শ্রীবরদরাজের মন্দিরে দেবতার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "প্রভো, আজ হইতে আমার সবখানি তোমার সেবায় নিযুক্ত হইল, আর আমি কাহারও নয়, আমায় গ্রহণ কর।" শ্রীবরদরাজ ভক্ত সন্তানকে সত্যই গ্রহণ করিলেন। রামানুজ কষায়-বস্ত্র ও দণ্ড বরদবাজের চরণ স্পর্শ করাইয়া সন্ন্যাস লইলেন। শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের ত্যাগবৈরাগ্যদীপ্ত অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া তাঁহাকে যতিরাজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, দলে দলে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল।

রামানুজের অসাধারণ প্রতিভা দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; দেখিতে দেখিতে শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বহু উচ্চবংশসম্ভূত যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

প্রথম শিষ্য হইলেন দাশরথী ; রামানুজের ইনি ভাগিনেয়, তারপর হারীত-গোত্রীয় কুরনাথ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশ রামানুজের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার জন্য অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মনে শান্তি ছিল না ; রামানুজকে সন্ন্যাস লইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি আত্মগরিমা বিস্মৃত হইয়া দীন কাতরভাবে বলিলেন—"সত্যই তুমি রাঘবের অনুজ। আমি অপরাধী, আমায় মুক্তি দাও ; আমি তোমার শরণাগত।"

আচার্য্যের এইরূপ দৈন্যে ও কাতরতায় রামানুজ তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন, পূর্ব্বগুরু যাদবপ্রকাশকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। তাঁহার নাম হইল গোবিন্দ দাস। তিনি অশীতি বর্ষ বয়সে "যতিধর্ম্মসমুচ্চয়" নামে এক অতুলনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করেন ; ইহার কিছুদিন পরেই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। রামানুজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপূর্ণ রামানুজের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁহাকে

আনিবার জন্য কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন এবং শ্রীবরদ-রাজকে তুষ্ট করিয়া রামানুজের সহিত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এতদিন পরে শ্রীযামুনাচার্য্যের অভাব ঘুচিল। আবার নানা দিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য শিক্ষার্থী ও ঈশ্বরপ্রেমিক শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। মন্দির মহিমাময় হইয়া উঠিল। শ্রীরামানুজ শ্রীমহাপূর্ণের চরণতলে আদর্শ শিষ্যের ন্যায় অতি দীনভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে আছে ঃ—

"শরীরং বসু বিজ্ঞানম্ বাসঃ কর্ম্ম গুণান্ অসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥"

'শরীর, ধন, জ্ঞান, বসন, কর্ম্ম, গুণ, প্রাণ সবই গুরুর জন্য যাহার, সেই যথার্থ শিষ্য, অপরে নহে।'

রামানুজের অকাতর ভক্তিশ্রদ্ধায় প্রীত হইয়া শ্রীমহাপূর্ণ তাঁহাকে যথারীতি ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র ও পঞ্চরাত্রাগম অধ্যয়ন করাইলেন; তারপর বলিলেন, "বৎস, অনতিদূরে গোষ্ঠীপুর নামে এক গ্রাম আছে; তথায় গোষ্ঠীপূর্ণ নামে এক পরমভক্ত পণ্ডিত বৈষ্ণব বাস করেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তোমায় অর্থযুক্ত বৈষ্ণব মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারিবেন না; অতএব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।"

গুরুবাক্যে তিনি যথাকালে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গিয়া চরণ বন্দনা করিলেন এবং স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন—"বিনা তপস্যায় চিত্ত-শুদ্ধি হয় না। তোমার চিত্ত অশুদ্ধ, মন্ত্র ধারণ করিতে পারিবে না।" রামানুজ ক্ষুণ্ণ হইয়া কঠোর তপশ্চরণ করিলেন ও পুনরায় গোষ্ঠীর চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! মন্ত্র দিন্।" গোষ্ঠীপূর্ণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তুমি মন্ত্রগ্রহণের অধিকারী নহ।" রামানুজ উন্মাদ, কাঙ্গালের মত অষ্টাদশ বার এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, 'নিশ্চয় চিত্তমল এখনও বিদূরিত হয় নাই, এ প্রাণ রাখিব না।' তিনি ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ ইহা জানিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—"এইবার তুমি নিরহঙ্কার হইয়াছ, মন্ত্রগ্রহণের অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু সাবধান এ মন্ত্র আর কাহাকেও দিও না; কেননা, কলিকালে ইহা দুর্ল্ভ মন্ত্র—যে কেহ শ্রবণ করিবে, তাহার বৈকুণ্ঠবাস হইবে।" এই বলিয়া তিনি রামানুজের কর্ণে তিনবার অর্থ সহিত বৈষ্ণব মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে রামানুজের অন্তরে অশেষ আনন্দ উথলিয়া উঠিল, চক্ষে পুলকাশ্রু দেখা দিল; তিনি কৃতার্থ হইয়া গুরুর চরণে ভূয়ঃ ভূয়ঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় লইলেন।

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল; সম্মুখে গোষ্ঠীপুরের অত্যুচ্চ বিষ্ণুমন্দিরের সিংহদ্বার লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে, যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই বলিলেন—"আইস, ঐ বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারদেশে আমি তোমায় এমন বস্তু দিব, যাহাতে ভব-ব্যাধি দূর হইবে।"

রামানুজের দিব্যমূর্ত্তি ও উচ্চ-ভাবাবেশ দেখিয়া দলে দলে লোক তাঁহার অনুসরণ করিল; প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যুবা, বালক, শিশু—অসংখ্য নরনারী বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া রামানুজের দিকে চাহিয়া রহিল। রামানুজ বিষ্ণুমন্দিরের উচ্চ তোরণের উপর উঠিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ভাই সব, ভগ্নী সব! আমি তোমাদের জন্য সিদ্ধমন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, উচ্চারণ করিলেই জগতের সব জ্বালা দূর হইবে, তোমরা মুক্তি পাইবে। বারত্রয় উচ্চারণ কর।" সমুদ্রগর্জ্জনের মত সহস্র কণ্ঠ হুঙ্কার দিয়া বলিল—"আমরা আকুল হইয়াছি; আমাদের কৃতার্থ করুন, মন্ত্রবাণী কি বলুন।" তখন রামানুজ চক্ষু মুদিত করিয়া, হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে বিশ্বাসের অগ্নিশিখা-সমন্বিত জলদধ্বনির মত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—"ওঁ নমোনারায়ণায়"; হাজার কণ্ঠে সে মন্ত্র প্রতিধ্বনি তুলিল, সকলের শরীরে দিব্যশক্তির বিদ্যুৎ স্ফুরিয়া উঠিল—সে যে কি এক অপার্থিব দিব্যোন্মাদনায় সে দিন গোষ্ঠীপুর মাতিয়া গেল, তাহার ভাষায় বর্ণনা

হয় না! সংসারের রাশি রাশি পাপ সেদিন পুড়িয়া ছাই হইল। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ রামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাঁহার পদ-রজে সকলে নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রফুল্লমুখে ঘরে ফিরিল। এই সংবাদ পাইয়া গোষ্ঠীপূর্ণ অধীর হইয়া পড়িলেন ; তিনি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"নরাধম, সর্ব্বনাশ করিলি, আমায় মহাপাপে ডুবাইলি! তোর অনন্তকোটী জন্ম নরকবাস হইবে।" রামানুজ বিনয়নম্রবচনে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—"প্রভো! ইহা জানিয়াই এই মহান্ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। গুরুবাক্যে এই মন্ত্রগ্রহণে আজি গোষ্ঠীবাসী বৈকুণ্ঠগমনের অধিকারী হইল ; গুরু-বাক্যেই ইহার বিনিময়ে আমার নিত্য নরকবাস হউক—আজ সহস্র নরনারীর মুক্তির পরিবর্ত্তে এই ক্ষুদ্র জীবনের অধোগতি কি অধিক শ্রেয়ঃ নহে ?"

রামানুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোষ্ঠীপতি স্তম্ভিত হইলেন। এমন নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতী জগতে একান্তই দুর্ল্লভ। তিনি রামানুজকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি সামান্য মানুষ নও। আমি তোমার শিষ্য হইলাম। স্বয়ং বিষ্ণুর অংশসম্ভূত না হইলে এমন বিশাল হৃদয় হইতে পারে না—আমার অপরাধ লইও না।"

রামানুজ গুরুর ভুজপাশ-মুক্ত হইয়া পদধূলি গ্রহণান্তর কহিলেন, "নিত্যগুরু আপনি, আপনার মুখেই

তো মন্ত্র-মাহাত্ম্য অবগত হইলাম। মন্ত্রশক্তির ক্ষুদ্র অংশ আপনি আমায় দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে আজ গোষ্ঠীপুর-বাসী মুক্তি পাইয়াছে—চরণে কিঙ্কর যেন চিরদিন স্থান পায়!”

রামানুজের এইরূপ বিনয়পূর্ণ বচনে পরিতুষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণ স্বীয় সন্তান সৌম্যনারায়ণকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন—রামানুজ সশিষ্য শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

রামানুজের কীর্ত্তি-প্রভাব বিকশিতপুষ্প-সৌরভের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীরঙ্গমের সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেববিগ্রহের ন্যায় পূজা করিতে লাগিল; সকলের প্রতি তাঁর অ[illegible]কিক অনুরাগ, শ্রীভগবানে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন জানাইবার জন্য প্রতিদিন ভীড় করিতে আরম্ভ করিল। রামানুজের এইরূপ গরিমায় বিদ্বেষপরায়ণ প্রধান অর্চ্চক তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে; কিন্তু তদীয় পত্নীর স্নেহপরবশ রামানুজ সে যাত্রা রক্ষা পান। প্রধান অর্চ্চক পুনঃ স্নানজলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে পান করিতে দেন। ইহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না, দেখিয়া অবশেষে এই পিশাচ-প্র[illegible] হিংস্র অর্চ্চক রামানুজের চরণে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

রামানুজের পাণ্ডিত্য ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে অসাধারণ যুক্তির কথা প্রচারিত হওয়ায়, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক একজন দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত রামানুজের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে গো-শকটে পূর্ণ পুস্তকরাজি থাকিত। রামানুজ তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনার ন্যায় পণ্ডিত জগতে অদ্বিতীয়, আমি তর্কে পরাস্ত হইলাম, ইহাতে আপনার জয় হইল।" এই বলিয়া তিনি তর্ক হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যজ্ঞমূর্ত্তি ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, উত্তর করিলেন "তবে কি বুঝিব--আপনার ভ্রান্তি দূর হইল, অভ্রান্ত মায়াবাদ বরণ করিলেন!" রামানুজ ইহা শুনিয়া অতিশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন; "আপনাদের মতে সবই তো মায়া, সবই তো ভ্রান্তি, যুক্তি-তর্কও মায়া—তবে মায়াবাদ অভ্রান্ত কেমন করিয়া প্রমাণ হইবে।"

যজ্ঞমূর্ত্তি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"দেশ, কাল, নিমিত্ত অতিক্রম না করিলে সত্য দুর্লভ, মায়াবাদীর যুক্তি দেশ কাল নিমিত্তের অতীত হওয়ারই সঙ্কেত—আপনারা এই গুলিতেই সত্য আরোপ করিয়া মুগ্ধ, সুতরাং ভ্রান্ত নহেন তো কি?"

এইরূপ বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। সপ্তদশ দিবস ঘোরতর তর্কের পর, রামানুজের যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি জয়ের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, স্পর্দ্ধিত কণ্ঠে

বলিলেন—“অতঃপর যতিরাজ, অসার বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অভ্রান্ত মায়াবাদী হইবেন কিনা বলুন।”

রামানুজ বিমর্ষ হইয়া সেদিন মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। কূটতর্কে পরাস্ত হইয়া জীবনের প্রত্যক্ষানুভূতি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি দেববিগ্রহের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন “হে নারায়ণ! যে সুবিমল ভক্তি-মন্দাকিনী স্নাত হইয়া হৃদয়ে অখণ্ড আনন্দস্রোতঃ উথলিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? মায়াবাদি-গণের কূট যুক্তি-তর্ক যে আমায় আচ্ছন্ন করিল—প্রভো! তোমার পাদচ্ছায়া হইতে সন্তানদের দূরে রাখার এই মহামায়া হইতে কবে মুক্তি দিবে?” হৃদয়পদ্ম যেন দুলিয়া উঠিল, ভক্তের আর্ত্তনাদ ভগবানের কাণে পৌঁছিল। রামানুজ দেবতার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলেন, “বৎস, উদ্বিগ্ন হইও না; ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য তোমার ভিতর দিয়া অচিরে প্রচারিত হইবে।”

অনুমান, কল্পনা, যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র-বিচার বুদ্ধিবৃত্তিকে যতই মার্জ্জিত করুক, মানুষের হিয়ায় ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ যদি না হয়, সবই যে নিরর্থক। ঈশ্বরের বাণী রামানুজের প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল; তিনি তৎ-পর-দিবস বিজয়ী বীরের মত যজ্ঞমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া বিচলিত হইলেন। গত কল্য যে মানুষ বিষণ্ণ মলিন মুখে

পরাজয়ের ব্যথায় কাতর ছিল, আজ এ স্বর্গের জ্যোতিঃ কোথা হইতে মিলিল—ইহা যে কোন অমানুষিক দৈববল ইহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। রামানুজের মুখের দিকে তাকাইতে তাঁহার যেন ভরসা হইল না; হৃদয়ের জমাট অহঙ্কার তিলে তিলে খসিয়া পড়িতে লাগিল। শাস্ত্রবিদ্যার দম্ভ প্রত্যক্ষ ভাগবত প্রসাদের আস্বাদ দেয় না, হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি করিয়া তুলে; ভগবানের করুণাদীপ্ত রামানুজের মূর্ত্তির সম্মুখে যজ্ঞমূর্ত্তি দ্রব হইয়া গেল। সপ্তদশ দিন এই মহানুভব ব্যক্তিকে কেবল শাস্ত্রের যুক্তিতে অপ্রস্তুত করিয়াই মনে সুখানুভূতি বড় অসার বোধ হইল, তিনি অনুতাপে কাতর হইয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, আমি তর্কশাস্ত্র-বলে শ্লেষোক্তি-দ্বারা আপনার মর্ম্মে আঘাত দিয়াছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত চাই। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে আপনার সাক্ষাৎকার মিলিয়াছে, আমার হৃদয়ে আজ অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের জগন্মূর্ত্তি—শ্রীভগবান যেন জাগিয়া উঠিতেছেন। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন—বৃথা পাণ্ডিত্য, আমায় মুক্তি দিন্, আমি আপনার চরণাশ্রিত।"

রামানুজ শ্রীভগবদ্বাণীর জাগ্রত নিদর্শন দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভক্তির অশ্রু নয়ন বিগলিত করিয়া ঝরিল। যজ্ঞ-মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বলিলেন—"ধন্য তুমি, ভগবানের কৃপার ভিখারী যে, সে ধন্য; চরম শত্রু যে

অহঙ্কার তা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ।" যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন "সত্যই আজ আমি ধন্য হইয়াছি, আমায় দীক্ষা দিন।"

তখন রামানুজ তাঁহার কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া, যথাবিধানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া উদপুণ্ড্র ধারণ করাইয়া, শঙ্খচক্র চিহ্নিত করিয়া মন্ত্র দিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া রামানুজের কাজের সহায়তা করিলেন, ঘোর মায়াবাদী বিষ্ণুভক্তির আস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য করিলেন।

রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে জয় করিলেন বটে; কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। যজ্ঞেশ, চণ্ডানুর, নম্বি, মরুডুর নম্বি রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য উপনীত হইলে, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞমূর্ত্তির হস্তে অর্পণ করেন। যজ্ঞমূর্ত্তি পাণ্ডিত্যাভিমান পাছে থাকিয়া যায়, তাই প্রথমে ইহাতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে গুরুপ্রদত্ত এই সম্মান উপেক্ষা করেন নাই।

রামানুজের অষ্টসহস্র গ্রামে দুইজন শিষ্য ছিলেন; যজ্ঞেশ ধনী এবং পণ্ডিত; বরদার্য্য নির্ধন এবং ভক্ত। তিনি একবার সশিষ্যে তিরুপতি-যাত্রার পথে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। আতিথ্য-গ্রহণের জন্য তিনি কয়েক জন শিষ্যকে যজ্ঞেশের নিকট প্রেরণ করেন। গুরুর আগমন সংবাদ পাইয়া যজ্ঞেশ বিহ্বল হইয়া বিপুল আয়োজনে

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, শিষ্যদের সহিত কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন না। আচার্য্যপ্রেরিত শিষ্যগণ তাঁহার নিকট যজ্ঞেশের এইরূপ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিলে, তিনি দরিদ্র বরদার্য্যের গৃহে উপনীত হন। তখন বরদার্য্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। স্নানান্তে বরদার্য্য-পত্নী একমাত্র বস্ত্র রৌদ্রে শুখাইতে দিয়া কুটীর মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন, রামানুজের আহ্বানে আকুল হইয়া পড়িলেন। গুরু অবস্থা বুঝিয়া, নিজের অঙ্গবস্ত্র গৃহ-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সাধ্বী গুরু-প্রদত্ত বস্ত্রে লজ্জা· নিবারণ করিয়া সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভাবিলেন, "সশিষ্য গুরুদেবের সেবার ব্যবস্থা কি হইবে? বরদার্য্য যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহা উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষেই যথেষ্ট নহে!" চিন্তার অবসর নাই; গ্রামে তাঁহার রূপলুব্ধ এক বণিক্ বাস করিত, আজ তাহার কথা মনে পড়িল। তিনি গুরুশুশ্রূষায় সর্ব্বত্যাগিনী হইতেও আজ কুণ্ঠিত নহেন, দ্রুত বণিকের নিকট গিয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং গুরুসেবা সমাপ্ত হইলে রাত্রে তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গুরুসেবার ধুম পড়িয়া গেল; বরদার্য্য কুটীর-প্রাঙ্গণে মহোৎসবের ব্যাপার দেখিয়া আনন্দাশ্রু রাখিতে পারিলেন না; পত্নীর নিকট হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

"তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু তোমার সতীধর্ম্ম নষ্ট হইবার নয়; আচার্য্যের প্রসাদ লইয়া কামান্ধ বণিকের নিকট উপস্থিত হইও, ঠাকুরের প্রসাদ-স্পর্শে তাহার কলুষ দূর হইবে।"

বরদার্য্য-পত্নী তাহাই করিলেন; বৈষ্ণবপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া সত্যই তাহার জ্ঞানোদয় হইল, সে ব্যক্তিও আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিল।

যজ্ঞেশ বহু আরাধনায় আচার্য্যের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হইলেন, প্রত্যাগমনের সময়ে তিনি ধনী যজ্ঞেশের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভাবিলেন—ব্রহ্মসূত্র যে ভাবে ভাষ্যান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে অদ্বৈত-বাদেরই ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। ব্যাসশিষ্য-বোধায়ন-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র যেরূপ সংক্ষিপ্ত, তাহাতেঅদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না, যমুনাচার্য্যের নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাও মনে পড়িল। তিনি কুরেশকে বলিলেন—"আমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিব; তুমি শাস্ত্রদর্শী, আমার লেখক হও। যদি ভাষ্যের অসঙ্গতি বোধ হয়, তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিবে—আমি উহার পুনঃ পর্য্যালোচনা করিব।"

কুরেশ পরমোৎসাহে গুরুর কার্য্যে যোগদান করিলেন, ভাষ্য লেখা চলিল। একদিন আচার্য্য বলিলেন, "জীব নিত্য ও জ্ঞাতা"—কুরেশের লেখনী স্থির হইল।

রামানুজ পর্য্যালোচনা করিলেন, বলিলেন লেখ, "জীব নিত্য ও জ্ঞাতা" ; কুরেশ অচল প্রস্তরমূর্ত্তি !

রামানুজ বার বার আলোচনা করিয়া ইহা ব্যতীত আর কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "লেখ, ইহাই ঠিক।"

কুরেশের ইচ্ছা 'জীব ভগবানের দেহ, ভগবানই আত্মা, নিত্য, অন্তর্য্যামীস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞঃ' আচার্য্য ইহাই বলুন ; কিন্তু রামানুজ ধৈর্য্যহীন হইয়া বলিলেন—"তবে তুমিই ভাষ্য রচনা কর, আমি নীরব হইলাম।" কুরেশ তবুও কথা কহিলেন না, নীরব রহিলেন। তখন রামানুজ ক্রোধান্ধ হইয়া কুরেশকে ভীম পদাঘাতে পাতিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুরেশ এইরূপ আকস্মিক পদাঘাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, যেমন ভাবে পতিত হইয়াছিলেন সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন, "যা হইবার হইয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তব্য কর।" কুরেশ বলিল, "আমার কিছু করার নাই ; আমি আচার্য্যের বস্তু, তিনি এই ভাবে রাখিয়াছেন, এই ভাবেই থাকিব।"

রামানুজ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলেন ; তাঁর ক্রোধ দূর হইল, তিনি নিজের ভ্রম বুঝিয়া কুরেশের নিকট উপনীত হইলেন, অশ্রুবিগলিত লোচনে কুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

তাঁর সে আকুল মিনতি-শ্রবণে কুরেশ কাঁদিয়া সারা হইল। গুরু-শিষ্যের সে প্রেম-বিহ্বল ভাব দেখিয়া সকলে পুলকিত ও বিস্মিত হইল। আচার্য্য বলিলেন—"বিষ্ণু-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব" এই অংশটী সংযুক্ত কর। কুরেশের মন প্রফুল্ল হইল, আবার তাহার লেখনী চলিল—এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইল।

বোধায়নবৃত্তি দুই লক্ষ শ্লোকাত্মক ; কাহারও মতে, উহার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ মাত্র। রামানুজ এই লক্ষ শ্লোকের ভাষ্য রচনা করেন। ইহার পর রামানুজ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; তাহার মধ্যে বেদান্ত-দীপ, বেদান্তসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, গদ্যত্রয় ও নিত্যগ্রন্থ প্রধান।

ভাষ্যকার্য্য শেষ করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। সঙ্গে ৭৪ জন শিষ্য, অন্যান্য সেবকবৃন্দ ব্যতীত ৭০০ শত সন্ন্যাসী শিষ্য, একাঙ্গী ১২০০০ হাজার, স্ত্রী-শিষ্যা ৩০০ এবং ব্রাহ্মণেতর অসংখ্য শিষ্য লইয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর যেমন অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রচারক হইয়াও কাশীতে চণ্ডালকে অস্পৃশ্য-বোধে দূরে রাখিতে চাহিলে, সে ব্যক্তি আচার্য্যের প্রচার ও আচারের পার্থক্য দেখাইয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছিল, রামানুজও তেমনি এক পারিয়া রমণীর কাছে অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিরুভালির তীর্থস্থানসমূহে ভ্রমণকালে এক পারিয়া রমণীকে সম্মুখে

দেখিয়া তিনি তাহাকে সরিতে বলেন ; সে রমণী অবিচলিত থাকিয়া বলিল—"কোন দিকে সরিব ? সম্মুখে আপনি, পশ্চাতে পবিত্র তিরুকল্লপুরম্, দক্ষিণে ভক্ত পরচোলের জন্মক্ষেত্র, বামে ভগবান তিরুভালিপতি অবস্থিত—আমি সরি কোথা ?"

আচার্য্য লজ্জিত হইয়া দেবমন্দিরের সেবাকার্য্যে এই রমণীকে নিয়োজিত করেন ; কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত এই অস্পৃশ্যতা দূর হইল না—ইহাই এ দেশে বিচিত্র কথা !

আচার্য্য রামানুজ দক্ষিণ সমুদ্রোপকূল ধরিয়া রামেশ্বরের পথে স্বীয় মত প্রচার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীভিল্লি বিঠ্ঠুরে স্বমত প্রচার করিয়া তিনি কুরুক্কুরের পথে চলিলেন। চিঞ্চাকুটী গ্রামে উপনীত হইয়া তিনি এক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুরুক্কুর কত দূর ?" বালিকা উত্তর দিল, "ডাকিলে শুনা যায়, আপনি কি সহস্র-গীতি পড়েন নাই !" আচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, বালিকাটী অনর্গল ধারায় শ্লোকাবৃত্তি করিল। নারীশিষ্য এদেশে নূতন কথা নহে।

আচার্য্য মহামুনি সাধকোপের পাদুকা পূজা করিলেন ; ইনি চণ্ডালবংশসম্ভূত ছিলেন। ভক্তির জগতে জাতি-ভেদ এ দেশের ধর্ম্ম নহে। ভক্তি ও দীনতা গুণে তিনি সর্ব্বজনপূজ্য হইলেন।

ইহার পর আচার্য্য অনন্তশয়নে আসিলেন। ভগবানের পূজা পঞ্চরাত্র মতে না হওয়ায় ইনি তাহার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইলেন ; কিন্তু নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ তাহাতে রাজী হইলেন না। রামানুজ স্বীয় প্রভাব-বলে তদ্দেশীয় রাজাকে দীক্ষা দিলেন এবং ভগবানের পূজা পঞ্চরাত্র-মতে প্রবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ভগবান রামানুজের বিধান গ্রহণ করেন নাই ; রামানুজ কোন এক অজ্ঞাতশক্তিবলে অনন্তশয়ন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে সিন্ধুনদী-মধ্যস্থিত এক দ্বীপে নীত হইলেন। অনন্তশয়নে পঞ্চরাত্র মত-প্রবর্ত্তন ভগবানের ইচ্ছা নহে, ইহা জানিয়া তিনি পশ্চিম সমুদ্রকূলে পণ্ডিত দক্ষিণামূর্ত্তির কাছে উপনীত হইলেন। এই সময়ে ইঁহার ন্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য অল্প লোকেরই ছিল। তিনি দক্ষিণামূর্ত্তি ভগবানের অংশ বলিয়া পূজা পাইতেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি শতমুখে রামানুজের ভাষ্যের প্রশংসা করিলেন। আচার্য্য দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট খ্যাতিলাভ করিয়া কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গুর্জ্জরপ্রদেশে গির্ণার পর্ব্বতে তিনি মহাযোগী দত্তাত্রেয়ের স্থান দর্শন করিলেন ; দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি কালীঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। সর্ব্বত্র রামানুজের ভাষ্য প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীর্থগুলিতে আত্মমত প্রচার

করিতে করিতে হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে তিনি "ওঁ নমো নারায়ণায়"—এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত সারদাপীঠে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। পণ্ডিতগণের সহিত তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইল। ভগবতী ভারতীদেবী স্বয়ং রামানুজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'ভাষ্যকার' উপাধি দিলেন। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' রব পড়িয়া গেল। সারদাপীঠে মূল বোধায়ন-বৃত্তি সংরক্ষিত ছিল, দেবীর কৃপায় তিনি তাহাও আয়ত্ত করিলেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি অভিচার প্রয়োগ করেন। ইহার ফল বিপরীত হইল—আচার্য্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হইয়া পণ্ডিতগণ উলঙ্গ অবস্থায় রাজপথে পৈশাচিক আচরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাশ্মীর-রাজ রামানুজের শরণ লইলেন, তাঁর করুণায় পণ্ডিতগণ রক্ষা পাইলেন।

অভিচার-প্রয়োগে রামানুজের কিছুই হইল না দেখিয়া, পণ্ডিতগণ দস্যুবৃত্তিদ্বারা বোধায়নবৃত্তির অপহরণে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রামানুজ ইহাতে নিরতিশয় বিষণ্ণ হইলে, কুরেশ প্রবোধ দিয়া বলিলেন, এই কয়দিনে বোধায়ন-বৃত্তি তাঁহার স্মৃতিগ্রাহ্য হইয়াছে এবং আবৃত্তি করিয়া রামানুজকে তাহা শুনাইলেন।

নানা তীর্থ পরিদর্শন করিয়া রামানুজ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা পঞ্চরাত্র মতে প্রবর্ত্তন করিতে তিনি পারেন নাই। ইহার পর শ্রীরঙ্গমের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যত তীর্থ ছিল, সর্ব্বত্র আচার্য্যের মতবাদ প্রচারিত হইল। তিনি শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নানা দিক্ হইতে অসংখ্য নারীপুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমাগত হইল। শ্রীরঙ্গম বৈষ্ণবতীর্থের সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

শ্রীরঙ্গমে 'গরুড় উৎসবে' বহুলোক সমবেত হয়। এই মহোৎসবে ধনুর্দ্দাস নামক এক ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন। আচার্য্য দেখিলেন, এই ব্যক্তি বিগ্রহ দর্শন না করিয়া এক রূপলাবণ্যসম্পন্না নারীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার ললাটের স্বেদবিন্দু সযত্নে মুছাইয়া দিতেছে, ক্লান্তি দূর করার জন্য ব্যজন করিতেছে; রামানুজ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সে ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সে ব্যক্তি বলিল, "এই রমণীকে আমি ভালবাসি, ইহাপেক্ষা সুন্দর পৃথিবীতে আর যে কিছু আছে, তাহা আমি মনে করি না।" রামানুজ তাহার এই একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পাইয়া তাহাকে শ্রীরঙ্গনাথের মূর্ত্তির সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি, এমন রূপ কুত্রাপি দেখিয়াছ কি না।"

ধনুর্দ্দাসের মোহ দূর হইল; ভগবদ্বিগ্রহদর্শনে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। ধনুর্দ্দাস এই দিন হইতে আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিল। ধনুর্দ্দাসের প্রতি আচার্য্যের অপরিসীম করুণা দেখিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। রামানুজ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, শিষ্যগণের ঐ যে সকল বস্ত্র শুকাইতেছে, ঐগুলির কিয়দংশ ছিঁড়িয়া দাও; পরে যাহা হয় আমায় জানাইও।"

সেই ব্যক্তি তাহা করিলে, শিষ্যগণের মধ্যে পরদিন ভীষণ গণ্ডগোল বাধিল। কে এই অপকর্ম্ম করিয়াছে, এই লইয়া অতি কুৎসিত তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। আচার্য্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাদ মিটায়া দিলেন।

তারপর শিষ্যগণকে বলিলেন, "ধনুর্দ্দাসকে আমি কথোপকথনচ্ছলে আমার কাছে রাখিব, তোমরা উহার প্রণয়িনীর অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিবে।"

ধনুর্দ্দাসের উপপত্নীর নাম হেমাম্বা। ধনুর্দ্দাস ভগবৎপরায়ণ হইলেও সে ধনুর্দ্দাসের সঙ্গ ছাড়ে নাই, আচার্য্যের আশ্রয়ে দেবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। শিষ্যগণ তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিল। হেমাম্বা বুঝিল, ঠাকুরের ভক্তগণ তাহার অলঙ্কার লইতেছে; কিন্তু এক পার্শ্বের অলঙ্কার মাত্র তাহারা লইতে পারিবে, সমস্ত অলঙ্কার দিবার ছলে সে যেমন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন

করিবে, অমনি তাহারা হেমাম্বাকে জাগ্রত মনে করিয়া পলায়ন করিল।

সময় বুঝিয়া রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। শিষ্যগণও অলঙ্কাররাশি রামানুজের নিকট আনিল ও সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইল। রামানুজ বলিলেন, "অতঃপর ধনুর্দ্দাস কি করে, দেখিয়া আইস।"

তাহারা অন্তরাল হইতে যাহা শুনিল, তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ধনুর্দ্দাসকে হেমাম্বা সকল কথা বলিলে, ধনুর্দ্দাস বলিল—"ছিঃ, ছিঃ, ঠাকুরের চরণে তোমার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ তো এখনও হয় নাই। অলঙ্কারে তোমার বোধ থাকায় দানের ভাব জাগিয়াছে; এক অঙ্গের অলঙ্কার লওয়ার পর, অন্য অঙ্গের অলঙ্কার দিবার প্রবৃত্তি জাগায়, তোমার দেহ-বোধ দূর হয় নাই—তোমায় লইয়া আমি কি করিব, তোমার সঙ্গই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে!"

হেমাম্বা করুণ অশ্রু বর্ষণ করিয়া ধনুর্দ্দাসকে ক্ষমা করিতে অনুযোগ করিল এবং সর্ব্বতোভাবে সংসারত্যাগের জন্য সে কঠোর তপস্যা করিবে, ইহা জানাইল। শিষ্যগণ আর আচার্য্যের নিকট আসিল না; তাহারা বুঝিল, কেন ঠাকুর ধনুর্দ্দাসকে এমন প্রীতির চক্ষে দেখেন।

ব্রাহ্মণ্যাভিমানী শিষ্যদের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। ইহার কিছুদিন পরে তদীয় গুরু মহাপূর্ণ যমুনাচার্য্যের এক

শূদ্র-শিষ্য "মাঢ়নেরি নম্বি"র ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করায় আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। রামানুজ গুরুর এইরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম সমর্থন করেন নাই। কিন্তু মহাপূর্ণ যুক্তিযুক্তভাবে ভক্তের যে জাতি নাই, ইহা সপ্রমাণ করিলে, জন্মগত জাতিভেদ-জ্ঞান তাঁহার দূর হয়।

রামানুজের চরণে মহাপূর্ণ একদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন, আচার্য্য ইহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। ইহা দেখিয়া শিষ্যগণ উভয়কেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানুজ বলিলেন "গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সে কার্য্যে শিষ্যের বাধা দিতে নাই।" মহাপূর্ণ বলিলেন—"আমি দেখিলাম, রামানুজকে আশ্রয় করিয়া মদীয় গুরু যামুনাচার্য্য মূর্ত্ত হইয়াছেন।"

রামানুজের যশোগৌরবে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল। দলে দলে নারীপুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে আসিতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যধিক প্রভাববৃদ্ধি হইতে দেখিয়া শৈবধর্ম্মী চোলাধিপতি বিচলিত হইলেন। মন্ত্রিগণের পরামর্শে রামানুজকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। যদি তিনি শৈবধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইবে, এইরূপ কঠোর আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

রামানুজের শিষ্যগণ এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। কুরেশ আচার্য্যের

বেশে চোলরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহাপূর্ণও কুরেশের অনুগমন করিলেন।

চোলাধিপতি কুরেশকে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। রামানুজের বহু অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া গেল না; অবশেষে, কুরেশ ও মহাপূর্ণকে রাজা বলিলেন—"তোমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্মে দীক্ষা লও। শিবাৎ পরতরং নাস্তি—এই প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া মুক্তি লাভ কর।"

কুরেশ আত্মধর্ম্ম প্রাণভয়ে পরিত্যাগ করিলেন না, বলিলেন "দ্রোণম্ অস্তি অতঃপরম্"। কুরেশ ও মহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটন করার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইল।

এক দেশ, জাতি অথচ সম্প্রদায়-ভেদে কি পৈশাচিক নিষ্ঠুর শাস্তি কুরেশ ও মহাপূর্ণ মাথা পাতিয়া লইলেন, তাহা আর বলিবার নয়। উভয়ের চক্ষুর্দ্বয় নিঃশেষে উৎপাটিত করা হইল; মহাপূর্ণ এ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবিত থাকেন নাই, কুরেশ শ্রীগুরুর আগমনপ্রতীক্ষায় শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়াছিলেন।

রামানুজ গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে দেশদেশান্তরে দ্বাদশ বর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নীলগিরি পর্ব্বতে ব্যাধ-পল্লীতে তিনি কিছুদিন বাস করিয়া, নৃসিংহপুরে আগমন করেন। রামানুজের ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ চোলরাজের অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া অভিচার-

প্রয়োগে চোলরাজের কণ্ঠক্ষত সৃষ্টি করে; লোকে অতঃপর তাঁহাকে "কৃমিকণ্ঠ" নামে অভিহিত করিত।

তন্তাপুরের রাজা জৈন-ধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার তনয়া ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হন; কোন ক্রমে কন্যাকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া তিনি রামানুজের শরণ লইলেন। জৈনগণ ইহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কন্যাকে রোগমুক্ত করিয়া বৃহৎ জৈন-সভায় তিনি জৈনদের পরাজিত করেন। জৈনরাজ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম লইলেন। অতঃপর জৈনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল। ভারতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভেদে যে নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে, যে শোণিতপাত হইয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে, মুছিবার নহে। বৈষ্ণব, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের অপেক্ষা কম বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে।

রামানুজ ছদ্মবেশে শ্রীরঙ্গম হইতে বাহির হইয়াছিলেন; তিরুনারায়ণপুরে তিলক চন্দন ফুরাইয়া যাওয়ায় তিনি বিষণ্ন হইলেন, রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—যাদবাদ্রিতে ইহা পাওয়া যাইবে। তিনি প্রাতঃকালে স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্যে রাখিয়া যাত্রা করিলেন। বেদস সরোবরে আচার্য্য স্নানাদি সমাপন করিয়া মুনি দণ্ডাশ্রয় যে প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় পুনরায়

সন্ন্যাস-বেশ পরিগ্রহ করিলেন; কিন্তু তিলকচন্দন মিলিল না। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন—ভগবান বলিতেছেন, যে তিনি নিকটস্থিত তুলসীবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। পরদিন প্রভাতে তিনি নারায়ণবিগ্রহ ও তিলকচন্দন আবিষ্কার করিলেন—মহাসমারোহে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হইল। মুসলমানবিজয়ে যাদবাদ্রিপতির মন্দির ভগ্ন ও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুনরায় দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠায় নগরবাসী তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিল।

কিন্তু উৎসব-মূর্ত্তি পাওয়া গেল না। স্বপ্নে ঠাকুর বলিলেন—এই উৎসবমূর্ত্তি দিল্লীশ্বরের গৃহে আছে। আচার্য্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া যাদবাদ্রিতে মহোৎসব করিলেন। এই মূর্ত্তি দিল্লীর সম্রাট্-দুহিতার নিকট ছিল এবং চণ্ডালগণ ইহা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন; এই হেতু উৎসবসময়ে মন্দিরপ্রবেশ ও বিগ্রহদর্শনে অস্পৃশ্যজাতির পক্ষে এখনও পর্য্যন্ত নিষেধ নাই। এইখানে আচার্য্য তাঁর ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে ৫২ জনকে থাকিতে আদেশ করিয়া, নৃসিংহপুরে গমন করিলেন।

এইখানেই তিনি মহাপূর্ণের দেহত্যাগ ও কুরেশের দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন, "কৃমি-কণ্ঠের" মৃত্যুসংবাদও পাইলেন। অতঃপর শ্রীরঙ্গম-যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণের কাতরতা দেখিয়া তিনি নিজে এক প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং স্থাপিত করিলেন।

চোলাধিপতির ভয়ে কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে স্থান দেওয়া হয় নাই। তিনি রঙ্গনাথকে প্রণাম করিয়া কুরেশের সন্ধানে বাহির হইলেন। আচার্য্যের শ্রীরঙ্গমের আগমন-সংবাদে সকলে পরমোৎসাহে মন্দিরাভিমুখে আসিতে-ছিল, পথেই রামানুজের সহিত কুরেশের সাক্ষাৎ হইল। প্রবাদ আছে, কাঞ্চীর বরদরাজের কৃপায় কুরেশ চক্ষু পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামানুজ দীর্ঘদিন জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ একে একে প্রস্থান করিতে লাগিল, তিনি দুর্ব্বল জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন। এখানেও তাঁর প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। তিনি অনর্গল শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে দিতে গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে চরণ রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন—ধরিত্রী আবার অনাথা হইল। শ্রীরঙ্গম মন্দির-প্রাঙ্গনেই তাঁর দেহ সমাহিত করা হইল।

শঙ্করের পর রামানুজের প্রাণান্ত পরিশ্রমে তুরীয় চৈতন্য বিগ্রহান্বিত হইয়া মর্ত্ত্যবাসীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিল।

ভারতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য শঙ্কর যে ভাবে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের আদর্শ সংরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু হয়তো সেই সত্যে জীবন উন্নীত করার সুযোগ ছিল না; তাই যেন রামানুজ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উভয় আচার্য্যের মতবাদ লইয়া তুলনা নিরর্থক। যুগের ডাকে একই কল্পকেন্দ্র হইতে যুগে যুগে একই সত্তা বিচিত্র বেশে আবির্ভূত হন। মর্ত্ত্যের পশ্চাতে যে নিগূঢ় রহস্য, তাহাকে মুক্তিদান করাই এই সকল অবতারপুরুষগণের জন্ম ও কর্ম্ম।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভারতে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল, তাহার অনুরূপ সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী এবং নিম্বাদিত্য কয়েকটী প্রধান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এইরূপ কথিত আছে—লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ইঁহারা নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিয়াছিলেন। রামানুজ-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে 'শ্রীসম্প্রদায়'ও বলা হয়। এই মতাবলম্বীরা বিষ্ণু-লক্ষ্মী, রামসীতা প্রভৃতি যুগল অথবা পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তির উপাসনা করেন।

ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। যাঁহারা সম্প্রদায়ের কঠোর নিয়মাদি পালন করেন, তাঁহাদের নাম আচরণী, অন্যথা হইলে অনাচরণী বলা হয়।

ইঁহারা উর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হৃদয়ে ও বাহু-যুগলে গোপীচন্দন-মৃত্তিকালাঞ্ছিত চিহ্ন ধারণ করেন। ইঁহাদের মন্ত্র—"ওঁ রামায় নমঃ।"

রামানুজ-সম্প্রদায় তিন প্রকার পদার্থ স্বীকার করেন —চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর; জীবাত্মা চিৎ, যাবতীয় পদার্থ অচিৎ, চিৎ ও অচিৎ যাঁহার শরীর, সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বের কর্ত্তা ও উপাদানই ঈশ্বর।

অদ্বৈতবাদীদের মত পরমব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার; এই সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন। ইঁহাদের মতে তত্ত্বের রূপ ও গুণ দুইই আছে। তাঁহার অনন্ত গুণ। রূপ দুই প্রকার—কারণ-রূপ, আর স্থূল-রূপ। পরমাত্মা কারণ-রূপ, বিশ্ব স্থূল-রূপ।

ইঁহাদের মতে ভগবান পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি গ্রহণ করেন—অর্চ্চা, বিভা, বূ্যহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামী। প্রতিমাদি অর্চ্চা, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার বিভা, বাসুদেব, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চারিটী বূ্যহ, ষড়্গুণশালী বাসুদেব পরমব্রহ্ম সূক্ষ্ম। সকল জীবের নিয়ন্তা মূর্ত্তি-বিশেষ অন্তর্য্যামী।

ইঁহারা পাঁচ প্রকার উপাসনা করেন:—

অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ।

দেবতাগৃহ ও পথের মার্জ্জন ও অনুলেপন অভিগমন; গন্ধপুষ্পাদি পূজাদ্রব্যের আয়োজন উপাদান; ইজ্যা ভগবদারাধনা; মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, রামানুজভাষ্য প্রভৃতি অভ্যাস স্বাধ্যায়; এবং ধ্যান, ধারণা, সমাধিই যোগ।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত শৈবমতাবলম্বীদের বিরোধ আছে, এমন কি শ্রীকৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণবদের সহিত ইঁহাদের তেমন প্রীতি নাই; বাংলার বৈষ্ণব-সমাজকেও 'শ্রীসম্প্রদায়' শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না।





মধ্বাচার্য্য

মধ্বাচার্য্য

নিখিল ভারতবাসী ভারতকে জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিবে, কিন্তু এক জাতি ও এক ধর্ম্মী বলিয়া কোনদিন স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ভিন্নদেশজাত ধর্ম্মের বিরোধেই আমরা ছন্ন-ছাড়া নহি; হিন্দু জাতিকে কোন ধর্ম্ম-সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, ইহাও ঘোরতর সমস্যার কথা। উপাস্য-ভেদে উপাসনা-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, জাতি-ভেদ কেন হইবে না!

প্রয়োজন-বস্তু থাকিলে তাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ অনিবার্য্য। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এমন কোন বস্তু যদি উপস্থিত করা যায়, যাহা সকলের প্রয়োজন-স্বরূপ হইবে, তাহা হইলে সেই বস্তুর সহিত সকলের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা অকাট্য। বস্তুটা যদি সমগ্র জাতির প্রয়োজন না হয়, উহা ধর্ম্মও যদি না হয়, সমস্যা থাকিয়া যায়—জাতির প্রয়োজনটায় একনিষ্ঠা চাই। প্রয়োজন-নির্ব্বাহ হেতু ভিন্ন জাতির উৎপত্তি; এইজন্য প্রয়োজন-বস্তুটার

স্বরূপনিরূপণ হওয়ায় জাতি-গঠনের যুগে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।

ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ—ইহা প্রখ্যাত কথা। এই হেতু ধর্ম্ম-মীমাংসা ভারত-জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। ধর্ম্ম-সমস্যাময়, রাষ্ট্র নয় তাহা নহে। তবুও রাষ্ট্র যদি সবখানি হইত, হয়ত সমস্যার সমাধান কতকটা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইবার নহে। মানুষ আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে বিভিন্ন কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া—সে কৃষ্টিতে পরস্পর যে পার্থক্য আছে, তাহা কোন আশু-স্বার্থের দায়ে এক হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, আর তাহা হওয়াও বোধহয় বাঞ্ছনীয় নহে। স্বার্থ আমাদের মুখ্য প্রয়োজন নয়, ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য; এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম-সমস্যার মীমাংসাই করিতে হইবে।

ভারতে হিন্দু-জাতি বলিয়া যে অংশ, তাহা কালের পদাঘাতে ক্রমেই অস্পষ্ট হইতেছে। আজ ভারতের প্রধান জাতিকে যে নামে অভিহিত করা হয়, ইহা কালপ্রভাবেই ঘটিয়াছে। এখনও ভারতে অধিকাংশ হিন্দু—এমন দিন হয়ত আসিবে যেদিন হিন্দু-জাতিই লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়রূপে গণ্য হইবে। উদাসীন জাতির কাছে এই কথাগুলি মারাত্মক নয়; কেন না, অনেকের ধারণা ভাগবতবিধান-বশেই আজ আমাদের অধঃপতন এবং যথাকালে ভবিষ্য-যুগে সনাতনধর্ম্ম-রক্ষায় ভগবান অবতরণ করিয়া ভারতের

পাপভার হরণ করিবেন ; কিন্তু সে ইচ্ছা আজও জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন যে না হইতে পারে, এমন কি কথা আছে !

জাতি না হইলে রাজ্য হয় না। স্বরাজ্যলাভ জাতির পক্ষেই সম্ভব। ভারতে সে জাতি কৈ ? মুসলমান, খৃষ্টান আছে, কিন্তু হিন্দু কি একটা জাতি ? জাতি হইলে তাহার কেন্দ্র-সত্য এক হইবে, আত্মশাসন-নীতি এক হইবে এবং একই লক্ষ্যে চালিত শাসিত লোকসমষ্টির প্রয়োজন হইবে। এই তিনের অভাব আছে।

আমাদের লক্ষ্য, আমাদের আচার, আমাদের সংহতি জাতিসূচক নয়, ভেদ-বশতঃ আমরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে একটী সম্প্রদায় যদি জাতির আকার গ্রহণ করিত এবং সেই বৃহৎ সমষ্টি যদি হিন্দু নামে আত্ম-পরিচয় দিত, হিন্দু জাতি বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব আছে, বুঝিতাম। পাঞ্জাবে শিখজাতি আছে, বাংলায় মুসলমান জাতি আছে—হিন্দু জাতি কোথায়। ভারতে একটা সাধারণ জাতি আছে—ব্রাহ্মণ জাতি, শূদ্র জাতি, অস্পৃশ্য জাতি প্রভৃতি উহার অন্তর্গত। এই জাতি বহু ব্যষ্টির সমষ্টি—সমন্বয়ের সমষ্টি নহে, অসংখ্য ভেদের সমষ্টি। ভেদগুলির মূলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষ্টি আছে। ব্রাহ্মণের যে কৃষ্টি, শূদ্রের তাহা নহে ; আবার শূদ্রের যে কৃষ্টি তাহা অস্পৃশ্যের নহে। আজ অনধিকার চর্চ্চা করিয়া শূদ্র

ব্রাহ্মণের কৃষ্টি অনুশীলন করিতে পারে, কিন্তু তাহা কৌতূহল-নিবৃত্তি। আসল কৃষ্টি—জাতির পরিচয়। ব্রাহ্মণের কৃষ্টি আশ্রয় করিয়া শূদ্র পরিচয় দিতে পারে না, দেওয়া উচিত নয়।

যদি বলি, ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টিই হিন্দুজাতির কৃষ্টি, তাহা হইলে একটা পথ পাওয়া যাইত—মূলতঃ তাহা নহে। এই অবস্থায় লঘিষ্ঠ আপনার কৃষ্টিতে যদি বহুকে উঠাইয়া লইতে পারে, জাতির আকার সম্পূর্ণ করিয়া তুলে, দেশের উপর সেই কৃষ্টি-সম্পন্ন জাতির বিস্তৃতি ও অধিকার সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ যদি সেই ভারতের বিশিষ্ট জাতি হয়, ব্রাহ্মণকে জাতির মত আকার ও প্রভাবের অধিকারী হইতে হইবে। শূদ্র অস্পৃশ্যকে তাঁহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারেন—যেমন শিখ, গুর্খা, পাঠান, হিন্দু আজ খৃষ্টান-জাতির কৃষ্টিরক্ষায় উপজীব্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ব্রাহ্মণ জাতি তাহাই করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। গোড়ায় ছিল আত্মবিস্মৃতি; ডগায় এই অধঃপতন-যুগে আরও অন্ধকার বুদ্ধি বিকৃত করিবে, তাহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ এদিকে দৃষ্টিহীন।

ব্রাহ্মণের জাতিগঠন-প্রয়াস কিন্তু চিরযুগ ধরিয়া চলিয়াছে; সে নজীর এখানে উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ দীর্ঘ করিব না। ব্রাহ্মণ যে জাতি চায়, সে জাতি দিব্য ব্রহ্ম-

স্বরূপের জাতি। তাই সে আয়াস ও তপস্যা অনির্ব্বচনীয়। আজ যে সকল ব্রাহ্মণ উদাসীন, তপস্যাবর্জ্জিত, আত্ম-প্রবঞ্চক, তাহাদের পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও তর্ক শ্রবণযোগ্য নহে। আমরা কৃষ্টিরক্ষায় ব্রাহ্মণকে অনাদিযুগ হইতে উদ্যত দেখিয়াছি। এ কৃষ্টিরক্ষা হয় জাতির গর্ব্বে, রাজ্যের গর্ব্বে। ব্রাহ্মণ এই ক্ষেত্রে নিরলস হইয়া প্রাণ ঢালিয়াছে। আজ অধঃপতনের দশায় বর্ত্তমান অবস্থা কলিযুগের বিধান বলিয়া ব্রাহ্মণের নিশ্চেষ্টতা ভীরুতার লক্ষণ। ভারতের ব্রাহ্মণ আজ মোহজর্জ্জরিত, ইহাও এক পক্ষে ভগবানের বিধান বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণের কৃষ্টি—বেদ, বর্ণাশ্রম ও পরলোকে বিশ্বাস। ইহা যখনই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তখনই ব্রাহ্মণকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ দেখিয়াছি, ব্রহ্মণ্য-বীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। কলিযুগেই এই কৃষ্টির উপর আঘাত পড়ে নাই, গোড়া হইতেই আঘাতের পর আঘাত সহিয়া ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইয়াছে—সে ইতিহাস ব্রাহ্মণ কি অস্বীকার করিবেন?

ব্রাহ্মণের কৃষ্টিরক্ষায় ব্রাহ্মণই উদ্বুদ্ধ হইবে, একের কৃষ্টি অন্যে রক্ষা করিবে না। আরোপের দায় চিরদিন কেহ বহে না; এইখানেই ব্রাহ্মণের ভুল হইয়াছে। জাতির ধর্ম্মরক্ষায় তিনি সহকারীদের সমকৃষ্টি দান করেন নাই—তাই বার বার অপরের সাহায্যে ব্রাহ্মণ যেমন

মাথা তুলিয়াছেন, যুগে যুগে পতনের স্রোতও তেমনি রুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন যুগে এইরূপ আঘাতে ও বিপ্লবে ব্রাহ্মণের কৃষ্টিনাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে নাই, সেই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের মূলে উহাকে সমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রয়াসই মুখ্যতঃ পরিলক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে বহু পরাক্রমশালী সংহতিশক্তির অভ্যুত্থান লক্ষ্যে পড়ে। ভারতের বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের মহিমায়; সে পরম কৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য আজ আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। কিন্তু অগ্রে গলদ কোথায় তাহা বাহির করিতে হইবে। ভারতের কৃষ্টি ব্রাহ্মণই গড়িয়াছে কত দীর্ঘ যুগের কঠোর তপস্যায়; সে কৃষ্টি যদি ভাঙ্গে, এ যুগে নূতন করিয়া কিছু গড়া সম্ভব নহে, আর তাহার প্রয়োজনও দেখি না। ব্রাহ্মণ বলিতে আজ আর জাতি-ব্রাহ্মণ বলিলেই চলিবে না; ব্রহ্মণ্য-কৃষ্টি-রক্ষায় উদ্যোগী নারী পুরুষ যাঁহারা মাথা তুলিবেন, ব্রাহ্মণজাতির আসন তাঁহারা লাভ করিবেন। ভারত ব্রাহ্মণের, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মের গোড়ায় বৈদিক দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে আমরা বিষ্ণু দেবতার নাম পাই। ঋগ্বেদে এই বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশ্যে কয়েকটী ঋক্‌ও আছে। ইনি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে

ইহার প্রাধান্য বাড়িয়াছে, শেষে উপনিষদে এই বিষ্ণু দেবতা পরম পুরুষের স্থান অধিকার করিয়াছেন। কঠোপনিষদে বিষ্ণুকে আত্মা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নাম-ভেদে তত্ত্ব-ভেদ হওয়ার কথা নয়; কিন্তু এই বিষ্ণু দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে এক প্রবল শক্তিশালী জাতি মাথা তুলিতে থাকে। বেদের তত্ত্ব শিব, সৌর প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম বিভক্ত হইয়া ভারতের প্রাণশক্তি বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের একনিষ্ঠ তপস্যাও এই যুগস্রোতঃ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ভারতে বৈষ্ণব নামে যে শক্তিশালী সম্প্রদায় জাগিয়া উঠে, বৈদিক আচার ও পদ্ধতি ইহাতে উপেক্ষিত হয়। ব্যাস-প্রণীত ভাগবত ও নারদ-বিরচিত পঞ্চরাত্র এই সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে; অসংখ্য ব্রাহ্মণ বেদাচার লঙ্ঘন করিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।

জাতিগঠনের মূলে যে তত্ত্ব, উহার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট শাস্ত্র ও অখণ্ড সংহতি চাই। ব্রাহ্মণ অখণ্ড-তত্ত্বের মর্য্যাদারক্ষায় উদাসীন হন নাই, শাস্ত্রপ্রণয়নে অযত্ন করেন নাই; কিন্তু দেশ ও জাতির আশ্রয়ে যে বৃহৎ সংহতি-শক্তি গড়িয়া উঠিলে ব্রাহ্মণের কৃষ্টি রক্ষা পায়, অধিকারবাদের আগল দিয়া সে দিকে তাঁহারা মনোযোগ দেন নাই, বরং ইহার পরিপন্থী হইয়াছেন। ব্যাস ও নারদ তাঁহাদের অসাধারণ

তপস্যা ও প্রতিভার সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভারতের পরমকৃষ্টির প্রচার-মানসে পুরাণ, ভাগবত, পঞ্চরাত্র রচনা করেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় ভাগবতধর্ম্মী একটা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে; এই সম্প্রদায় হইতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। ইনি ভারতের প্রাণ-পুরুষ, মূর্ত্ত স্বরূপ।

সান্দীপনী মুনির নিকট কৃষ্ণচন্দ্র নিখিল বেদ, উপনিষদ্ সাংখ্য ও যোগ অধ্যয়ন করেন। শৈবধর্ম্মী কংসকে জয় করিয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী মথুরা প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে তাঁর ধর্ম্ম অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। কুরুক্ষেত্রে এই নিগূঢ় বৈষ্ণবধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র তিনি অর্জ্জুনের নিকট প্রচার করেন। ইহার পরে উত্তর ভারত ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম সুপরিচিত হয়। মেঘাস্থিনিস ভারতের বিবরণ দিতে গিয়া মথুরাপ্রদেশে বাসুদেব সম্প্রদায়ের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শত বৎসরের কথা। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও পাণিণির গ্রন্থে বাসুদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাসুদেব সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। অশোকের রাজ্যকালে বৈষ্ণবপ্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণ-পূজা প্রবর্ত্তিত থাকায়, সাধারণের চিত্তে মহাপুরুষ-পূজার ভাব পুষ্ট হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ জাতি এই সুযোগে কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে

একই সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণু দেবতার সহিত সংযুক্ত করিয়া ইঁহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার-পদে বরণ করিয়া লইলেন। অদ্বয় ব্রহ্ম-তত্ত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্ম-কাণ্ড যুগল ধারায় ভারতের মাটী অভিষিক্ত করিল। বৌদ্ধবাদের প্রভাবে উদীয়মান বৈষ্ণবশক্তির গতিপথ রুদ্ধ হইয়াছিল; এই সুযোগে ব্রাহ্মণ-জাতি উভয়ের মূল উপড়াইয়া ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

শুঙ্গরাজগণের অভ্যুত্থানে নষ্টপ্রায় ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৮. অব্দে পুষ্পমিত্র ব্রাহ্মণের কৃষ্টিরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। বৌদ্ধবাদ ভারত হইতে বিদায় লইল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচন্দ্রের অশরীরী মূর্ত্তি ভারতের সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় শতাব্দীতে পতঞ্জলীর সময়ে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ভারতবাসী পূজা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলিয়া তুরীয় ব্রহ্মকে মূর্ত্তিতে নামাইয়া আনিয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ সাংখ্য ও যোগ প্রচার করিয়া, পুরুষ-প্রকৃতির তুরীয় স্বরূপ দেখাইয়া মোক্ষবাদ প্রচার করিলেন। চার্ব্বাকের দল উঠিল—উপাস্য ও উপাসনা ভেদ, কর্ম্ম-ভেদ, স্বর্গ-নরক ভেদ প্রভৃতি কাল্পনিক কৃষ্টির দায় হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিল, সুখসম্পত্তির দিকে জাতিকে লক্ষ্য স্থির করিতে নির্দ্দেশ দিল। কৃত কর্ম্মের জন্য ঐহিক পারত্রিক কোন জগতেই

যে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। পাপের জন্য শাস্তি, পুণ্যের জন্য পুরস্কার পাওয়ার হেতু নাই, ইহা তাহারা দেখাইতে চেষ্টা করিল। যে ঘোর আস্তিক্যবুদ্ধি ও পরলোকে বিশ্বাস মানুষকে জড়-মূর্ত্তির উপাসনায় ও বৈকুণ্ঠবাসে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহার মূল শিথিল করার এই কৌশল ব্রাহ্মণ-জাতির ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছু নহে। এই জন্য নাস্তিক্য-দার্শনিকগণের আদর ব্রাহ্মণসমাজে অভাব হয় নাই; অন্য দিকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন নূতন জ্ঞান প্রকাশ করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রভাব নষ্ট করার প্রচেষ্টা করিল। কিন্তু মাথার চেয়ে মানুষের হৃদয়-বস্তুটা বড় হইয়া সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি ধরিল—যোগদর্শনের ব্রহ্মযুক্তি বাসুদেবে প্রযুক্ত হইল, যুক্তিতর্কের বিজ্ঞান কৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রহ্মের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-রূপে প্রতিষ্ঠা দান করিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ভারতে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল।

এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্য ও পশ্চিম প্রদেশ এবং মগধে ছড়াইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রের হৃদয় অধিকার করিয়া, তারপর তামিল জাতির মধ্যে ইহার অসাধারণ প্রভাব পরিদৃষ্ট হইল। সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় নূতন যুগের সূচনা করিল।

শুঙ্গ বংশের পর গুপ্ত বংশের রাজগণ ব্রাহ্মণদের প্রভাবরক্ষায় যত্নবান্ হন; কিন্তু ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের পূর্ব্বভাব-

রক্ষা আর সম্ভব হইল না। গুপ্তরাজগণ হইতে হর্ষরাজের যুগ পর্য্যন্ত ভারতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অবাধে চলিল, অসংখ্য মন্দির মঠ নির্ম্মিত হইল। ভারতের ব্রাহ্মণ এই পৌরাণিক প্লাবনের মধ্যে ডুব দিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষায় আজও যত্নবান্ আছেন। আমাদের মনে হয়, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ যদি ভারত আক্রমণ না করিত, শঙ্করপ্রভাব বৈদিক ভারতের ভিত্তি হইত, ব্রহ্মণ্য-গরিমাই আবার মাথা তুলিত। কিন্তু রাজশক্তি একেবারে বিদেশীর হস্তে পতিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন অসম্ভব বোধেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। দৈববলের উপর আস্থা রাখিয়া সহজ জীবন-যাত্রায় তাঁহারা আজ নিজেদের এলাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণের ইহাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে কি! ভারতে জাতিগঠনের ভার বিধাতা তাঁহাদের হাতেই দিয়াছেন; শেষ রক্ত-বিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কার্য্য তাঁহাদের করিতে হইবে। বিরোধ স্বধর্ম্মরক্ষার চরমনীতি নহে, আজ সমন্বয়ের যুগে ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য চাই। জাতি-ব্রাহ্মণ আজ মূঢ় উপায়হীন, ভারতের ব্রহ্মণ্যশক্তি কিন্তু অব্যাহত।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-যুগের পর আমরা ফল্গুধারার মত আবার ব্রহ্মণ্যশক্তিকেই ভারতকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার তপস্যায় নিয়োজিত থাকিতে

দেখিতেছি। আজ ভারতের কৃষ্টি-নাশে অনেক স্বদেশবাসীকে উদ্যোগী দেখি; কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের কৃষ্টির উপরই জাতিগঠনের বিপুল প্রয়াস দেখা গিয়াছে—ব্রাহ্মণ শূদ্র অভেদে।

বৈদিক দেবদেবীর সমুচ্চয় ব্রহ্মসূত্রে হইয়াছে; ব্রাহ্মণ জাতিকে একই কেন্দ্রে, একই লক্ষ্যে সন্নিবদ্ধ করার ইহা সদুপায়। কিন্তু বহু দেবদেবীর লয়-স্থান কোন আস্তিক্যগুণবিশিষ্ট বস্তুতে হয় না; কাজেই বেদান্তের ব্রহ্মবাদ নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ—সকল আকার, সকল রূপ তাহা না হইলে ডুবাইয়া দেওয়া যায় না। সমস্যা ইহাতেই বাড়িয়াছে। অনুলোম-নীতি প্রকাশক; বিলোমে লয়—মূলে লয়, তত্ত্বে নির্ব্বাণ। ভারতের ধর্ম্ম তাই নিঃশ্রেয়স্, মোক্ষ রূপে প্রতীত হইল। ইহাতে দেশ থাকে না, জাতি থাকে না, কৃষ্টি থাকে না। কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হইল। পৃথিবী দুঃখময়, পরম সুখের স্বপ্নও চিত্ত আকর্ষণ করে। মোক্ষে যখন আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, তখন কর্ম্মে ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। সারা জাতিই উদাসীন হইল। ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্ম ব্যাসদেব পুরাণে ইতিহাসে দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন ত্যাগী তপস্বী, তাঁহাদের গার্হস্থ্যজীবন ছিল কর্ম্মক্ষয়-হেতু। ইহাতে প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই, বিসর্জ্জনের প্রতীক্ষায় দিন

গণিয়া যাওয়া ছাড়া জীবনের অন্য উদ্দেশ্য ইহাতে নাই। সৌম্য, শান্ত, পবিত্র, উদ্বেগশূন্য ব্রাহ্মণচরিত্র আদর্শস্বরূপ হইল। অন্যের ব্রহ্মণ্যাচার অনধিকার বলিয়া কতদিন দাবিয়া রাখা যায়। প্রথম ক্ষাত্রজাতির মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিল; তারপর বৈশ্য, শূদ্র ব্রাহ্মণাচারে উদ্বুদ্ধ হইল। ভারত হইল ত্যাগভূমি। বেদ এ-জাতির কেন্দ্র-সত্য, তীর্থ এ-জাতির অভিন্ন ধর্ম্মক্ষেত্র—তবুও আমরা ঐক্যবদ্ধ-জাতি হইতে পারি না, কেন না, জাতি-সংজ্ঞার যে লক্ষণ ও অভিব্যক্তি, তাহা ভারতের ধর্ম্মবিরোধী। রামচন্দ্রকেও পরিশেষে বশিষ্ঠের প্রভাবে আত্মবিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মের গতিমুখ ফিরাইতে চাহিয়া-ছিলেন, তুরীয় ব্রহ্মকে ধর্ম্মের লক্ষ্য না করিয়া গুণাতীত চিদ্‌ঘন মূর্ত্তিকেই জাতির উপাস্য করিয়া গিয়াছেন। যুক্তি অকাট্য হইলেই ধর্ম্ম হয় না, দেখিতে হইবে জীবন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে জাতীয় জীবনেরই অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টা দেখা দিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু সে পথ রোধ করিতে অভিযান করিলেন, জাতির জীবন-প্রণবতার সম্মুখ হইতে মূর্ত্তবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রকে সরাইয়া বিষ্ণুকে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্ম বিষ্ণুর নামান্তর; বিষ্ণু গুণাতীত, নিথর, নিস্পন্দ, তুরীয় চৈতন্য।

কৃষ্ণপূজা ভারতে দৃঢ়. মূল পাইয়াছিল, তাহা উৎপাটিত করা গেল না। অদ্বৈতবেদান্তধর্ম্মরক্ষার জন্য

শঙ্কর গীতার ভাষ্য রচনা করিলেন, ব্রহ্মসূত্রের অনুগত অর্থ করিলেন—ভাবজগতে হিন্দুর অদ্বৈতবাদ রক্ষা পাইল, কিন্তু বস্তুজগতে তাহা টিকিল না। শঙ্করের পর রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব। ভারতের ব্রহ্মসূত্র তাঁহার ব্যাখ্যায় নূতন মূর্ত্তি ধরিল—তিনি চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, বা জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে যথাক্রমে তত্ত্ব ত্রিধা বিভক্ত করিলেন। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, রামানুজাচার্য্য ব্রহ্মকে কর্ত্তা ও উপাদান বোধে জগৎকে তাঁর নিত্যপ্রকাশ বলিয়া প্রমাণ করিলেন। বৈদান্তিক মতে, জীব ও জড় পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া অস্বীকার করা হয়। এই স্বচ্ছ নির্ম্মল চৈতন্যে জড় ও জীব অধ্যারোপিত প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু রামানুজ বলিলেন—জীব ও জড়ের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, এ জগৎ ব্রহ্মের শরীর, পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা তার দাস-স্বরূপ। "ঈশ্বরাদন্যঃ তদ্বন্নিত্যচেতনঃ তদ্দাসে জীবো ভবতীতি সিদ্ধং"—অদ্বৈতবাদকে কথঞ্চিৎ বিশেষিত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইল। ইহা ব্রাহ্মণেরই কীর্ত্তি।

জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, এই বোধ জাতিকে যেন সর্ব্বদা স্বপ্নাবিষ্টের মত কতক্ষণ জীবত্বের স্বপ্নভঙ্গ হয়, এই প্রতীক্ষায় উদাসীন করিয়া রাখিয়াছিল; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, জীব নিজের স্বতন্ত্র চেতনার সন্ধান পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাহার নিজের

বলিয়া কিছু বুঝিল ; সে বস্তুটা পরমাত্মা হইতে অস্বতন্ত্র কিছু না হইলেও, জগতের অস্তিত্বটা একান্ত প্রতিবিম্ববৎ ধাঁধার হেতু হইল না, তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিল। মনে রাখিতে হইবে, ইহার মূলে ব্রাহ্মণের তপস্যাই মূর্ত্তি লইয়াছে। আবার পরবর্ত্তী যুগে আর এক ব্রাহ্মণ রামানুজের মতবাদ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের নূতন ভাষ্য রচনা করিলেন। বিষয়টী আরও বিশদ হইয়া উঠিল। তাঁর মতে, অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্যবাদ ইহার সবখানি নহে, একেবারে ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন বস্তু; ভারতের দর্শনশাস্ত্রাদির সাহায্যেই জগতে তুরীয় ব্রহ্মপ্লাবন হইতে জীব ইহাতে কতকটা আত্মরক্ষা করিল। দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য্য বেদবিহিত ধর্ম্মের পুনঃ-প্রবর্ত্তনে ভারতের কৃষ্টিরক্ষায় আবির্ভূত হন, দক্ষিণ ভারতেই রামানুজাচার্য্য ভারতের ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের নূতন সংস্কার সাধন করিয়া ইহা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে অনুভূতিগম্য করিয়া তুলেন। আবার এই দক্ষিণ ভারতেই আচার্য্য মাধ্বদেব অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মসূত্রকে জীবনগত করার উপায় স্বরূপ দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মসূত্র প্রমাণ প্রয়োগে যেন মূর্ত্তি লইতে চলিয়াছে।

ভারতে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া জাতিগঠনের প্রয়াস হয় নাই; কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মের নামান্তর হইলেও, এই দেবতার নাম আশ্রয় করিয়া ভারতের বৈষ্ণবসম্প্রদায়

বেদান্তধর্ম্মের বস্তুতন্ত্র রূপ দিতে চাহিয়াছেন। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্য দিয়াই জাতিগঠনের প্রয়াস খুব স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানে ভারতে যে চারিজন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, রামানুজ তাহার প্রথম, মাধ্বাচার্য্য দ্বিতীয়, তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী ও চতুর্থ নিম্বার্কাচার্য্য।

শ্রীমাধ্বের পূর্ব্বনাম বাসুদেব। দক্ষিণ কানারার অন্তঃপাতী উদ্‌পির নিকটস্থিত পজকা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মধিগেহ। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি আবির্ভূত হন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণীত হয়। রামানুজাচার্য্যের অন্তর্দ্ধান-সময়ে মাধ্বাচার্য্য নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন।

শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া রামানুজ যে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করেন, তাহা ব্রহ্মসূত্রের বিরোধী তত্ত্ব হয় নাই; কিন্তু মাধ্বাচার্য্য মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জীববাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার জন্য মাধ্বাচার্য্য ব্রাহ্মণ-সমাজে কিরূপ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সৌরপুরাণে পাওয়া যায়—সে কথা পরে উল্লেখ করিব।

শ্রীমাধ্ব ব্রাহ্মণসন্তান। যথাসময়ে বেদ উপনিষদাদি শিক্ষা সমাপন করিয়া তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। কোন কারণে তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা যায় নাই; অতঃপর অচ্যুতপ্রচনামা আচার্য্যের নিকট তিনি সন্ন্যাস

গ্রহণ করেন। গুরুর নিকট শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা তাৎ-কালীন পণ্ডিতগণের নিকট বিরুদ্ধবোধে উপেক্ষিত হইল— তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

রামেশ্বর, ত্রিবেন্দ্র প্রভৃতি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি উদপিতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিষ্য তাঁর সহিত একত্র হইল। তিনি সশিষ্য হিমালয় যাত্রা করিলেন। বদরিকাশ্রমে ব্যাস-দেবের সহিত নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তিনি গীতাভাষ্য ব্যাসদেবকে উপহার দেন। ব্যাসদেব তাঁর ভাষ্যপাঠে সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে তিনটী শালগ্রামশিলা প্রদান করেন। শ্রীমাধ্ব পরমোৎসাহে সারা ভারতে তাঁহার ধর্ম্মমত-প্রচারের জন্য বাহির হন। কলিঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। ত্রৈলঙ্গদেশে শোভনভট্টের সহিত অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ লইয়া তর্ক উঠিল; শোভনভট্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীমাধ্বের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এই ঘটনায় শ্রীমাধ্বের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় বহু লোক তাঁর অনুবর্ত্তী হয়। অসংখ্যশিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া মাধ্বাচার্য্য উদপিতে ফিরিয়া আসেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর সাফল্যের স্বর্ণরশ্মির সম্মুখে হীনপ্রভ ও মলিন হইয়া যায়। এই সময়ে আর এক ঘটনায় শ্রীমাধ্বের যশোসূর্য্য মধ্যগগনে সমুদিত হইল।

এক বণিক্ অর্ণবপোত করিয়া দ্বারকা হইতে মলয়বর প্রদেশে যাইতেছিলেন; পোতখানি দৈবদুর্ব্বিপাকে জলমগ্ন হয়। মাধ্বাচার্য্য দিব্যশক্তিপ্রভাবে জানিতে পারিলেন, ঐ পোতে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে এক কৃষ্ণবিগ্রহ আবৃত ছিল, পোতের সঙ্গে সেই ঈশ্বরবিগ্রহ জলশায়ী হইয়াছে। তিনি লোকজন লইয়া বিগ্রহ উদ্ধার করেন এবং উদপিতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। মাধ্বসম্প্রদায়ের ইহা সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এই দেববিগ্রহের পূজা ও উপাসনায় রত থাকিয়া তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সূত্রভাষ্য, ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য. অনুবাকানুনয়বিবর্ণ, অনুবেদান্তরসপ্রকরণ, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবততাৎপর্য্য, গীতাতাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, তন্ত্রসাব প্রভৃতি।

অতঃপর দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া তিনি শাঙ্কর ও রামানুজসম্প্রদায়ের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়া মহা আন্দোলন সৃষ্টি করেন। অনেকে তাঁর মতানুসরণ করে। শ্রীমাধ্ব ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদ খণ্ডন করিলেও, শঙ্করপন্থীদের সহিত তাঁর বিরোধ ছিল না। তিনি শৃঙ্গেরি মঠে পূজা করিতে যাইতেন; বিষ্ণুবিগ্রহের সহিত শিব, পার্ব্বতী ও গণপতির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ রোধ করিয়াছিলেন। রামানুজের ন্যায় ইনিও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য রাখিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী

ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষাগুরু হওয়ার অধিকার অন্যকে প্রদান করেন নাই। নিতান্ত অন্ত্যজ জাতিকেই তিনি দূরে রাখিতেন, ইহা ব্যতীত শূদ্রজাতিকে উপদেশ দিতে বাধা দিতেন না।

উদপির মন্দির ব্যতীত মধ্বাচার্য্য আরও আটটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরগুলিতে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে; এখনও মহাড়ম্বরে বিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় তপ্তলৌহ দ্বারা স্কন্ধে ও বক্ষস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত করার বিধান ইঁহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে। উর্দ্ধপুণ্ড্র মাধ্বসম্প্রদায় ধারণ করে; রামানুজ-সম্প্রদায় হইতে ইহা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত।

মাধ্বসম্প্রদায়ের দেবমন্দিরগুলি সবই তুলব রাজ্যের অন্তর্গত। মধ্বাচার্য্যের প্রধান শিষ্য ছিলেন পদ্মনাভতীর্থ; তিনি ইঁহার হস্তে ব্যাসশিলা ও শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় মূর্ত্তি প্রদান করিয়া দ্বৈতবাদপ্রচারের অনুমতি প্রদান করেন। পদ্মনাভতীর্থ দক্ষিণাপথের পশ্চিমভাগে চারিটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য পুনরায় হিমালয় যাত্রা করেন। তিনি কাশীর পণ্ডিতগণের সহিত যুক্তিযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পরিদর্শন করিয়া গোয়া রাজ্যে আত্মমত স্থাপন পূর্ব্বক উদপিতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত

হন। এই স্থানে অসংখ্য সারস্বত ব্রাহ্মণ তাঁর যুক্তির সম্মুখে মাথা নত করেন। ইহারা সকলেই কৈবল্য-মঠের শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পর মধ্বাচার্য্য মহাপ্রস্থান করেন। শুনা যায়, বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবের সহিত তিনি এখনও অমর দেহে বাস করিতেছেন।

মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরকে অসংখ্য গুণময় বলিয়া কীর্ত্তিত করা হয়; জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা ইঁহারা স্বীকার করেন। জীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরাধীন—এই সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু উভয়ে এক নহে। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে জীবে ভেদ, জীবগণের ও জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ প্রকার ভেদের কথা ইঁহাদের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

জীবের লয় ইহারা স্বীকার করেন না, নির্ব্বাণ মুক্তির কথা আমলে আনেন না, শৈবধর্ম্মীর যোগ, ভিন্নপন্থী বৈষ্ণবধর্ম্মীর সাযুজ্য ইঁহারা স্বীকার করেন না। ভগবান স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, ইহাই তাঁর সবখানি নয়—তিনি আবার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়া সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবীকে লইয়া তাঁর বৈকুণ্ঠে অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য-সুখ-ভোগের কথা ইঁহারা উল্লেখ করেন।

ইঁহাদের উপাসনার অঙ্গ তিনটী—অঙ্কন, নামকরণ এবং ভজন। ভজন কায়িক, মানসিক, বাচিক, এই ত্রিবিধ। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিনটী মানসিক ভজন; সত্যবচন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন, এই চারিটী বাচনিক; দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ, এই তিনটী কায়িক ভজন।

গীতার ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বাদ ইঁহাদের অনুবাদে সুস্পষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য, লক্ষ্মী অক্ষর নিত্য, বিষ্ণু ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র। তাঁহাদের উপনিষদে আছে—

"ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষয়তাঃ পরো হরিঃ॥"

বিষ্ণু প্রীত হইলে জীবের লয় অসম্ভব, তবে তাহার আর জন্ম হয় না—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সার্ষ্টি মুক্তি হয়। ভগবানের সহিত জীবের সাযুজ্য অসম্ভব।

মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থরাজী, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও পঞ্চরাত্র ইঁহাদের পাঠ্য। কথিত আছে, মধ্বাচার্য্য শৈব ছিলেন, তারপর বৈষ্ণব মত আশ্রয় করেন; তাঁর জীবন-ব্যাপী শ্রমে, শৈব ও বৈষ্ণবে যে বিসম্বাদ তাহা দূর হইয়াছিল। অনন্তেশ্বর নামক শিবমন্দিরে তাঁর দীক্ষা হয়। তিনি শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত 'তীর্থ' উপাধি গ্রহণ করেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ে বিষ্ণুর সহিত শিব ও পার্ব্বতী স্থান পাইয়া থাকেন। মাধ্ব ও শাঙ্কর গুরুদিগের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শৃঙ্গেরি মঠের মহান্ত অদ্যাপি উদপি নগরে কৃষ্ণমন্দিরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। মধ্বাচার্য্য ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেও, পূর্ব্বতন আচার্য্যের সহিত সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করেন নাই—মাধ্বাচারীদের সহিত শাঙ্করপন্থীদের মিল, ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভেদ দূর করার ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইহাতে ব্রাহ্মণ্য-ভারতের সহিত তাঁর মতের যে সমুচ্চয় হইয়াছিল তাহা নহে; বরং চিরকাল তাঁহাকে হেয় করিয়া রাখার ভবিষ্যদ্বাণীরূপে পুরাণে শ্লোকনিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল শ্লোক হইতে ইহাও বুঝা যায়, যে বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জীবনগত করার মানুষের যে অধিকার, তাহা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কোনদিন ভালচক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম অবতরণমুখী, জীবনের সহিত সংযুক্তি চায়—এ প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে। একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতে এই প্লাবন আসিয়াছে। আমরা তাহার ক্রমবিকাশ দেখাইব। যদি এ জাতির ধর্ম্মই আত্মরক্ষার ভিত্তি হয়, সে ধর্ম্মের অনুশীলন উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

* * *



নিম্বার্ক-ধর্ম্মাবলম্বী

শঙ্করের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ; শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ইঁহাদের প্রধান; কিন্তু আচার্য্য ভাস্কর শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী বলিয়াছেন। "যে তু বৌদ্ধ-মতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্র-কারণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।" ইহা শঙ্করের উপর কটাক্ষপাত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মধ্বাচার্য্য ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্ম্মে শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবেশে প্রবেশের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীদের কটাক্ষও বিষপূর্ণ। সৌরপুরাণে মধ্বাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলেও ভূমণ্ডল ম্লেচ্ছব্যাপ্ত হইলে মানবেরা সর্ব্বা-চারপরিভ্রষ্ট হইবে, সেই সময়ে অন্ধ্রদেশে দুর্ভাগ্যসম্পন্না বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এক দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ হইতে এক পুত্র জন্মিবে, তিনিই মধ্বাচার্য্য। "অদ্বৈতনিন্দানিরতাঃ প্রচ্ছন্ন-গ্রন্থ-গৌরবাঃ"—মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে এইরূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে—

"মধুদর্শিতমার্গেন পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবাঃ কলৌ।
ভবিষ্যন্তি ততো ম্লেচ্ছাঃ শূদ্রা যুগবহিষ্কৃতাঃ॥"

—অদ্বৈতপন্থীদের দ্বৈতবাদের উপর এইরূপ বিষদৃষ্টি হিন্দু সম্প্রদায়ে বিরল নহে; দর্শন ও পুরাণাদিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু মতবাদপ্রচারের গোড়ার বস্তুর উভয় দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করার অনুশীলন হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মকে বা তত্ত্বকে বিচারবিশ্লেষণে যে পাওয়া যায় না, তাহা তাঁহারা জানিতেন; তবুও শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া ব্রহ্মসূত্র হিন্দুধর্ম্মীর এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে মানুষের চিত্ত নিষ্কলুষ হয়, দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠ করা ব্রহ্মদর্শী হওয়ার একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য হয় নাই, ইহার সঙ্গে শৌচাদি অন্তর ও বাহিরের সাধন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আচার ও অনুভূতি মানুষকে অধ্যাত্মদৃষ্টির অধিকারী করিয়া তুলিত; আচার যখন বড় হইয়া উঠিল, দর্শনাদি শাস্ত্র অনুভূতির উদ্রেক না করিয়া মতবাদখণ্ডনের যুক্তিজাল বিস্তার করিল—ভগবানের পথের যাত্রী সেইদিন পথহারা হইল। এক পক্ষ বলিলেন —মুক্তি লক্ষ্য; সে মুক্তি অবিদ্যা হইতে মুক্তি। উহা ক্রিয়াসাধ্য নহে; উৎপাদ্য অবিদ্যা দূর হইলে স্বরূপ-মুক্তিই প্রকাশ পায়। অন্য পক্ষ বলিলেন—না, মুক্তি লক্ষ্য বটে, কিন্তু ক্রিয়াসাধ্য উপাসনায় ইহা লভ্য। এক পক্ষ বলিলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ—সগুণ ও সবিশেষ মায়া, ভ্রম মাত্র। অন্য পক্ষ বলিলেন, ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ; তাঁহার মহিমা আছে, শক্তি আছে; ব্রহ্ম নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদিশক্তিবিশিষ্ট। "নিরস্তসমস্তোপপ্লব কলঙ্ক-নিরতিশয়-জ্ঞানানন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়রত্নং হি

ব্রহ্মত্বং”—এ জগৎ মায়া নয় ; চেতন, অচেতন এই বিলাস-প্রপঞ্চ তাঁর রচনা। বিরুদ্ধ পক্ষ বলিলেন, ব্রহ্মের ক্রিয়া থাকিলে দুঃখ অনিবার্য্য, বিকার অপরিহার্য্য ; ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। অন্য পক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ভগবান মানুষ নহেন, তিনি অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ। ব্রহ্ম ও জীব বিম্ব-প্রতিবিম্ব, এই সব মানব-বুদ্ধির কল্পনা। সৃষ্টি বিকার নয়, ব্রহ্মের পরিণাম। তিনি নিয়ত ক্রিয়াশীল। কর্ম্মে জ্ঞানে সমুচ্চয়িত। ব্রহ্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়।

এই তর্কের শেষ নাই। ব্রহ্মানন্দ-রস অপেক্ষা ব্রহ্ম-নিরূপণ ব্যাপার বড় হইয়া উঠিল। জ্ঞানচর্চ্চায় মানুষের মন মরুভূমি হইয়া পড়িল। ভক্তির মন্দাকিনী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভারতে নামাইয়া আনিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ ও লীলা, তাহা বাসুদেব-প্রবর্ত্তিত ঐকান্তিক যোগের উত্তম রহস্য। ইহা গীতার পুরুষোত্তমবাদ ; শ্রুতি, পুরাণে ইহার সমর্থন-সূচক নিবন্ধ অপ্রতুল নহে। এই বাসুদেব সম্প্রদায় হইতে অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ জীবন লইয়া দেখা দিয়াছিল। জগৎ বিবর্ত্ত বা মায়া, ভ্রান্তি বলিয়া ধরিয়া লইলে মর্ত্ত্যপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে ; তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা ব্রহ্মের পরিণামবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ভেদাভেদের হেতু—কার্য্য ও কারণ ভেদ ; কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কার্য্যে নানাত্ব-বোধ। এই সকল দার্শনিক-

তত্ত্ব-বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল দেখাইতে চাহি, ব্রহ্মবিচার জীবনকে দেখে নাই, আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহা নির্ব্বিশেষ নির্ব্বাণ, তাহা লক্ষ্য হওয়া কোনমতেই শ্রেয়ঃ নহে। জীব চায় নিরতিশয় আনন্দ; সেই আনন্দের আস্বাদ আনন্দময় বস্তুতে নিজের সবখানির যুক্তির উপর নির্ভর করে। তাই মায়াবাদীর মোক্ষবাদ লক্ষ্য করিয়া ভেদাভেদবাদী আচার্য্য ভাস্কর বলিয়াছেন—"নিঃসম্বন্ধা, নিরাস্বাদস্ত্বৎপক্ষে মোক্ষঃ স্যাৎ, চৈতন্যমাত্রাবশেষাৎ। বদন্তি কেচিৎ শৃগালত্বং বনে বরম্।" নির্ব্বিষয় মোক্ষ হইতে বনে শৃগালত্ব—এই সকল আচার্য্যগণ শ্রেয়ঃ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধবাদকে নাকচ করিতে গিয়া শূন্যবাদের বিরুদ্ধে যে অদ্বৈতবাদ, তাহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলৌকিক; আবার ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ নিছক দ্বৈতবাদও যুক্তিবিজ্ঞানহীন জোরের কথা। উভয়বাদই জন্যার্থে; এই হেতু ধর্ম্মযুগের ইতিহাস অবগত হওয়ার পক্ষে এই সকলের আলোচনা নিরর্থক না হইলেও, ভাগবত-তত্ত্ব-লাভের ইহা সুপ্রশস্ত পথ নহে। সে পথ মতবাদের আবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া বস্তুতন্ত্র-রূপে জীবনেই অবতরণ করিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দুরূহ কর্ম্ম সিদ্ধ হওয়ার মূলে দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার যে তুল্যরূপে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; আজ গীতার তত্ত্ব অবধারণ করিতে হইলে এই পূর্ব্বাচার্য্যগণের

দার্শনিক মতবাদসম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকার তাই প্রয়োজন হয়। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ একটা বস্তুর বিচার-যুগেই সম্ভব, সে বস্তু বিচারের বাহিরে হইলে তখন নির্ব্বাক্ হইতে হয় এবং কখনও যদি তাহার আস্বাদ মিলে, তাহাকে দ্বৈত বা অদ্বৈত তত্ত্ব বলিয়া আর তর্ক করিতে হয় না। সে "নিতুই নব" দ্বৈত, অদ্বৈত তো বটেই, আবার "দ্বিভুজ-মুরলীধারী" মানবমূর্ত্তি বলিয়া এই মানব-হিয়ায় তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরার বস্তু হয়। সে ধরা অধরার বিষয়ে শুধু ভাব ও ভাষার অনুবাদ লইয়াই কথা। ভারতের হিন্দুধর্ম্ম এই অনুবাদতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে এবং সে পথে আজ অন্ধকার নাই; স্বয়ং বাসুদেব ধ্রুব-নক্ষত্র-রূপে এ জাতির কর্ণধার। সে বাসুদেব গুরুমূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যভূমিতেই বিচরণ করেন, তাঁর কায়ব্যূহ-মূর্ত্তিই জাতিগঠনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে জাতি ভাগবত জাতি। ভাগবত-লীলাবিলাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সে বিগ্রহ-রূপ ধীরে ধীরে ভারতে ফুটিয়া উঠিতেছে।

বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের ন্যায় আচার্য্য নিম্বার্ক তত্ত্বকে অনুবাদে প্রদর্শন করার একজন যুগ-প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্কাচার্য্যের সম্প্রদায় চতুর্থ এবং বিষ্ণুস্বামি-প্রবর্ত্তিত রুদ্র সম্প্রদায় তৃতীয় বলা যাইতে পারে। ভক্তমালে নিম্বার্কাচার্য্যকে "আদিত্যকুঞ্জরঅজ্ঞান

জুহরিয়া”—অর্থাৎ অজ্ঞান-গুহা উদ্ভাসিত করিয়া নিম্বার্কাচার্য্য আদিত্য-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন।

নিম্বার্কাচার্য্যের পূর্ব্বগুরুর নাম পাওয়া যায় না; পূর্ব্বাপর পরিচয়ের জন্য এই সম্প্রদায় তাঁহাকে সনকাদি ঋষির সহিত পরম্পরাযুক্ত করিয়া পরিচয় প্রদান করে। আচার্য্য স্বয়ং নারদকে গুরুরূপে পূজা করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। সনকাদি সম্প্রদায় নিম্বার্কের মতানুবর্ত্তী। এই সম্প্রদায়কে আচার্য্যের নামানুসারে “নিম্বার্কিত” বলা হয়।

অনেকে বলেন—ভাস্করাচার্য্য ও আচার্য্য নিম্বার্ক একই ব্যক্তি। আচার্য্য ভাস্করের ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে; কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তাহা বলা যায় না। কেননা, ভাস্করাচার্য্যের স্থিতিকাল অনেকে নবম শতাব্দীতে স্থির করেন, নিম্বার্কাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে ছিলেন; ইহা ব্যতীত, ভেদাভেদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উভয় ক্ষেত্রে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায়, তাহাতে উভয়কে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ভাস্করাচার্য্যের ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র, রূপান্তর-রহিত বলা হইয়াছে; কারণে অভেদ, কার্য্যে ভেদ—এই হেতু সগুণ হইয়াও তিনি নিরাকার; নিম্বার্কের মতে, ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত উভয় মতবাদের এই

পার্থক্যটুকু থাকায় নিম্বার্কাচার্য্য যে প্রসিদ্ধ আচার্য্য ভাস্কর নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

নিম্বার্কাচার্য্যের পরবর্ত্তী দেবাচার্য্য তাঁহাকে নিয়মানন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান হয়, শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতেই আচার্য্য নিম্বার্কের নব মতবাদের স্ফূর্ত্তিতে আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের উপর ইনি কোথাও আক্রমণ প্রকাশ করেন নাই, আত্মমত-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসূত্রার্থ আপনার অনুকূল অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; পরে অদ্বৈতবাদের তর্ক-জালে আচার্য্য নিম্বার্কের অভিমত আবৃত হয় দেখিয়া দেবাচার্য্যই শঙ্কর-মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস করেন। নিয়মানন্দের পূর্ব্ব-নাম ভাস্কর থাকা আশ্চর্য্য কথা নয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহাকে সূর্য্যের অবতার বলিয়া আখ্যা দেন। নিম্বার্ক নাম হওয়ার এক ইতিবৃত্ত আছে।

বৃন্দাবনের নিকট তিনি বাস করিতেন। একদিন জনৈক দণ্ডী বা জৈন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। বিচার-কাল দীর্ঘ হওয়ায় সূর্য্যাস্ত হয়। তখন আচার্য্য কিঞ্চিৎ খাদ্যাদি উক্ত সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী বা জৈন সন্ন্যাসীদের সূর্য্যাস্তের পর ভোজন নিষিদ্ধ। খাদ্য প্রত্যাখ্যাত হইলে, নিম্বার্ক যোগবলে সূর্য্যকে সম্মুখস্থ নিম্ববৃক্ষের শাখায় স্থির

রাখিয়াছিলেন ; ইহা হইতেই তাঁহার নিম্বাদিত্য অথবা নিম্বার্ক নাম হইল। কাহারও কাহারও মতে, নিম্বার্ক তৈলঙ্গ দেশের নিম্ব নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহাকে নিম্ব-গ্রামের গৌরবসূর্য্য অর্থে নিম্বার্ক বলা হইয়াছিল—ইহাই নিম্বার্ক নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য, আমাদের অনুমান হয়।

আচার্য্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা অতি সংক্ষিপ্ত "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামক এই ভাষ্য নিমাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ইঁহাদের প্রধান শাস্ত্র।

নিমাৎ সম্প্রদায়ের তুইটী শ্রেণী—বিরক্ত ও গৃহী। কেশবভদ্র হইতে বিরক্ত সম্প্রদায়, হরিব্যাস হইতে গৃহস্থ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে ; মথুরার নিকট ধ্রুবক্ষেত্রের গদী হরিব্যাসের সন্তানগণই রক্ষা করিতেছেন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূল কথা—ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ ; কিন্তু তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন, এইজন্য জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ, জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম ভিন্ন ইহার অন্য উপাদান নাই—কাজেই ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। আচার্য্য ভাস্করের সহিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। নিম্বার্ক ভাস্করের প্রভাবে দ্বৈতবাদী হইয়াছেন, এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ভাস্করের সহিত মতানৈক্যও দেখা যায়। ভাস্কর বলেন—উপাসনার দ্বারা জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, জীবের

ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, মুক্তাত্মার দেহ-নাশে ব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক যুক্তি হইয়া থাকে; অভিন্নতা-প্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য, ইহাই মুক্তি।

আচার্য্য নিম্বার্ক এই কথা অস্বীকার করেন। মোক্ষ-বাদকে এমন করিয়া নাকচ করার স্পর্দ্ধা ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন—ব্রহ্ম অংশী, জীব তাঁহার অংশ। জীবের স্বরূপ এই অংশত্ব, ইহা নাশ পাইবার নহে; বস্তুর স্বরূপ যাহা তাহার ঐকান্তিক নাশ নাই। মুক্তজীব, সেও জীব ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; জীবের জীবত্ব নিত্য, জগৎ ব্রহ্মাত্মার, কিন্তু ব্রহ্ম নহে।

শঙ্কর যুক্তি-বিজ্ঞানে জীবত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মায়িক বলিয়াছেন; নিম্বার্ক ব্রহ্মের সব ভাবই পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ, সগুণ, কিছুই ব্রহ্মগুণবর্জ্জিত নহে, সবখানিই চিদ্‌ঘন। ব্রহ্মের বিচার নাই, বিশ্লেষণ নাই; ব্রহ্মের সাধ্য অসাধ্যের মাপকাটী নাই, সগুণ নির্গুণ, দৃষ্টি-ভ্রম। নির্গুণ অর্থে অনন্ত গুণ, তাহার গুণের ইয়ত্তা নাই। যেটুকু প্রকাশ তাহা অংশ। এই অংশের গুণটুকু দেখিয়া তাঁহাকে সগুণ বলি। অব্যক্ত যাহা তাহা নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত; কেন না, জীব তাহার পরিমাপে অসমর্থ।

অদ্বৈতবাদীরা নিম্বার্কের এই সরলার্থে পরিতুষ্ট নহেন, ইহা অসমীচীন বলিয়া উড়াইয়া দেন; কিন্তু বুদ্ধির

প্যাঁচের মধ্যে ইহা কায়দায় না পাওয়া যাইলেও, হৃদয় এই যুক্তি অস্বীকার করে না। জীবত্বের নাশ নাই, অংশত্বের অনুভূতি থাকে, মুক্তাবস্থায় জীব যখন আপনাকে ও জগৎকে অভিন্ন ব্রহ্ম-রূপে সন্দর্শন করে, তখনই সে আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়, অমরত্ব লাভ করে; নিজের নিত্যত্বে সে প্রতিষ্ঠা পায়—আর এইজন্যই যুগে যুগে এই সিদ্ধকোটীর থাক জগন্মুক্তির সন্ধান দিতে আত্মমায়ায় অধিরোহণ করিয়া জগতে অবতরণ করেন। যুক্তিবাদী বলেন—জীবত্বের বোধ কি বদ্ধাবস্থায় থাকে না? অংশ-বোধ যদি বদ্ধাবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ঐ বোধ কিরূপে সম্ভব হয়! এই প্রশ্নের উত্তর নিম্বার্ক দেন নাই, দেওয়ার প্রয়োজন নাই; আমি জীব বা আমি ব্রহ্ম, এই বোধ থাকা না থাকা তুল্য কথা, যদি তত্ত্বের সহিত যুক্তিলাভ না হয়। অংশ-বোধ সিদ্ধ হয়, অংশীর সহিত সংযুক্ত হইলে। তর্ক উঠিতে পারে, পূর্ণের অংশ সৃজন-শক্তির বিক্ষেপ ব্যতীত হয় না; শক্তির বিক্ষেপ হইলে পূর্ণের বিকার হয়, বিক্ষিপ্ত শক্তিও বিকার্য্য, অতএব নিম্বার্কের যুক্তি সঙ্গত নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদীরা তর্ক তুলিয়াছেন। সৃষ্টি স্বপ্ন ও মায়া, কিন্তু তাঁহারাও এই মায়া-তত্ত্বকে বুঝাইতে পারেন নাই; তত্ত্বের ন্যায় মায়াও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। পূর্ণ যিনি তিনি অংশ হইতে পারেন না, চেতন যিনি তাঁর জড়মূর্ত্তি

ধারণ করা সম্ভব নহে, এইরূপ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডী পার হইয়া নিম্বার্ক বলিলেন—হাঁ, মানববুদ্ধির ধারণানুকূল শক্তিটুকু তাঁহার শক্তি নহে; "অসাধারণ শক্তিমত্ত্বাৎ" তাঁর শক্তি অসাধারণ, সম্ভব অসম্ভব, যুক্তি-বিচার ছড়াইয়া তাঁর প্রকাশ। পূর্ণ হইতে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইলে পূর্ণত্বের হানি হয়; মৃৎকলসপূর্ণ জলক্ষয়ে পূর্ণকলসের হানির ন্যায় ব্রহ্ম অপচয়-যুক্ত নহেন, তিনি চিরপূর্ণ, অজ, নিত্য, শাশ্বত। তাঁহার সৃষ্টি জগৎ, জগৎ তিনি নহেন; কিন্তু তাহা হইতে ভিন্নও নহেন—জগতের এই স্বরূপ-জ্ঞানই মুক্তি। "ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়সাধারণ-শক্তিমত্বাৎ"—দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম তদ্রূপ জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মের বিকার না হইলে দধি হয় না। দুগ্ধের বিকার কি এই জগৎ, তদুত্তরে বলিতেছেন—"পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তি-বিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্যাব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি"—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ অনন্তশক্তিশালী ভগবান আত্মশক্তির স্পন্দনে আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিয়াছেন এবং অবিকৃত রূপেও অবস্থান করিতেছেন, সর্ব্বশক্তিমত্তার ইহাই লক্ষণ। দৃশ্যমান জড়শক্তির সহিত তাঁহাকে তুলনা করিয়া বিচার-যুক্তির জগতের অনুরূপ ব্রহ্মের ধারণা মূঢ়তা!

তত্রাচ তিনি জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের

কয়েকটী উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "অবিভাগেঽপি সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।" সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, সূর্য্য ও প্রভা তদ্রূপ। আর একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁর মতবাদের সার্থকতা প্রদর্শন করিব— "ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ ব্রহ্ম অভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।"

বজ্রবৈদূর্য্য পৃথিবীর বিকার, কিন্তু পৃথিবী হইতে একদিক্ দিয়া যেমন অভিন্ন, স্বীয় বিকৃত রূপ বশতঃ আবার ভিন্ন, জীবও তেমনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ভিন্ন, অতএব এ আপত্তি সঙ্গত নহে।

নিম্বার্কের জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধে একটী চরম প্রশ্ন উঠিতে পারে—মহাপ্রলয়-কালে জগৎ তাঁহাতেই লীন হইবে, এই অবস্থায় তাঁহাতেও তো বিকার উৎপন্ন করিবে। নিম্বার্ক ইহার উত্তর দিয়াছেন—গুণ ও গুণী অভেদ, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, ইহা গুণাভাব নহে; অনন্ত গুণ তাঁর স্বভাব, সৃষ্টির কারণ তাঁর গুণের অংশ মাত্র প্রকাশ, প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলে, অংশগুণ উপাদান কারণে বিকার সৃষ্টি করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন—বিকাররূপ তরুপত্র, জীবদেহাদি পৃথিবীতে পতিত হয়, তদ্রূপতা পায়, পৃথিবীর বিকার হয় না, জগদ্রূপ ব্রহ্মে লীন হইলে তদ্রূপ বিকার-সম্ভাবনা নাই।

জীবের বৈকার্য্যও তিনি অস্বীকার করেন ; কেন না, যাহা গুণের বিকার, তাহা নিত্য হওয়ায় বাধে ; আত্ম-সিদ্ধান্তের ইহা বিরোধী ভাব। অতি চমৎকার উত্তর দিয়া তিনি এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন—জীবের প্রকাশ ব্রহ্মের ঈক্ষণে, তিনি দেখেন নিজকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, এই দেখার শেষ নাই, দেখার গুণে বিচিত্র সৃষ্টি, সৃষ্টির স্বরূপ ঈক্ষণ-বীজে। তিনি হইয়াছেন ; হওয়ার বীজ আছে, স্বরূপ আছে, তাহার লয় নাই। ব্রহ্ম নিত্য, জগৎ নিত্য, জীব নিত্য ; নিত্যের উপাদানে নিত্য বৃন্দাবনের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা মায়া নশ্বর বলিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে।

তর্ক বুদ্ধির সামগ্রী। এক যিনি তিনি পৃথক্ হইবেন কেমন করিয়া ? পৃথক্ দর্শন যদি পরমার্থ হয়, ব্রহ্ম নিত্য পৃথক্, তাঁর অভেদ অখণ্ডত্ব সম্ভব নহে ; যদি তিনি বিভু, তবে অংশ কি—ইহার স্বতন্ত্র উত্তর নাই। ভগবদ্-বস্তুর লীলা-চাতুর্য্য—বিচারে ইহাই হয়, আস্বাদে অন্যরূপ। তিনি অভেদ, আবার ভেদও বটেন ; ভিন্ন ও অভিন্ন দুইই, গীতার ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমবাদকে মর্ত্ত্যের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ করার এই প্রয়াস বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিরন্তর প্রবাহে বহিয়াছেন। পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূল-মন্ত্র যে ধর্ম্মবাদ, তাহা মাটীর সহিত সংযুক্ত করিয়া ধরণীর এই মুক্তিপ্রচেষ্টা অভাবনীয়। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্ম ও জগৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তু-রূপে প্রতীয়মান করার যুক্তিই অদ্বৈতবাদীদের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। জগৎ ও জীবন বাদ দিয়া পরমাত্মার সন্ধান একের বর্জ্জনে অন্যের প্রতিষ্ঠা—পক্ষান্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া ধর্ম্মকে জীবনে নামাইয়া আনিয়াছেন। জাতি-গঠনের মূলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কি অপার্থিব দান তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধিরোহণের ভাব জাতির আত্মসাৎ করার পর অবতরণের সিদ্ধ-নীতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণই দিয়াছেন। শ্রুতির "দেবায় জন্মনে" গীতার "মদ্ভাবমাগতাঃ", "মামেতি" প্রভৃতি নবজন্মের স্বপ্ন বৈষ্ণব-সাধনায় মূর্ত্ত, প্রকট হইয়াছে। আমরা ইহার ধারাবাহিক প্রবাহ আরও দেখাইব।

*　　*
*



রামানন্দী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী

রামানন্দ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি

চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে বেদান্তদর্শনের সুবিমল জ্যোতিশ্ছটা নয়ন ঝলসিয়া দেয়। পাঠানের আক্রমণ ভারত তেমন আমলে আনে নাই—উহা কাল-বৈশাখীর ঝটিকাবর্ত্তের ন্যায় যেমন অকস্মাৎ প্রলয় বাধাইয়াছে, তেমনি চকিতে অপনীত হইবে, এইরূপ ধারণায় ভারতের ব্রহ্মণ্য-প্রতিভা জ্ঞানচর্চ্চায় অবগাহিত ছিল ; ক্ষাত্রশক্তি অন্যদিকে মুমূর্ষু। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই আলাউদ্দিনের রণবাহিনী দক্ষিণভারতজয়ে অভিযান করিয়াছে ; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর আত্ম-কীর্ত্তির জয়ধ্বজা উড়াইল। নিরাপদ্ রাজ্য শাস্ত্র-চর্চ্চার উত্তম ক্ষেত্র ; কিন্তু পাঠান-শক্তির সহিত সংঘর্ষ-যুগেই বিজয়-নগরে বেদান্ত-দর্শনের চরম প্রচার আরম্ভ হয়, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

কিন্তু পাঠান-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিতে না করিতে প্রবল মোগল-শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি প্রায় তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ

ভারত কখনও ভাগবত-চেতনা হারায় নাই। গভীর জ্ঞানানুশীলনের অবকাশ না থাকায়, সর্ব্বসাধারণের প্রাণে ভারতীয় ভাবধারা রক্ষার উপায় স্বরূপ এক অভিনব পথে যাত্রা সুরু হইল।

ভারতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কি অমৃত-মন্দাকিনী বহিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলন-গুলি লক্ষ্য করিলে ও তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভক্তিবাদ একদিকে রামানন্দকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর নারী পুরুষকে ভাগবত ধর্ম্মে সঞ্জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে; অন্যদিকে মাধ্বাচার্য্য ও নিম্বাকাচার্য্যের ভাব-ধারায় বাংলায় নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার বান ডাকিয়াছে। বিদেশীর আক্রমণে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর, আচার্য্য আনন্দগিরি প্রভৃতি শঙ্কর-পন্থীগণের মনীষায় ব্রাহ্মণসমাজ আত্মধর্ম্মরক্ষায় সমর্থ হইতেন বটে, কিন্তু ভারতের কোটী কোটী ব্রাহ্মণেতর জাতি আজ যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহার মূলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আত্মদানই আছে। আমরা সংক্ষেপে এই কথাই অতঃপর উল্লেখ করিব।

দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু-সভ্যতা ও আদর্শের রক্ষায় প্রতি শতাব্দীতে দার্শনিক আচার্য্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর ভারত ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই এক

প্রকার বৈদেশিক জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ায়, হিন্দু-আচার রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতের পুণ্য মলয় তুঙ্গভদ্রের উত্তর এবং মহারাষ্ট্রেই বসন্তের শোভা সৃজন করিয়াছে; যুক্তি, তর্ক, দার্শনিক জ্ঞান, গবেষণা এই স্থানে উচ্চরোল তুলে নাই—কিন্তু হিন্দুজাতির প্রাণে যে অমৃত-সিঞ্চন করিয়াছে, ভারতে আজও যে বিশ কোটি লোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদে উচ্চকণ্ঠে হিন্দুজাতির গৌরব ঘোষণা করে, তাহা ইহারই ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে!

১৩১০ খৃষ্টাব্দে মল্লিক কাফুরের বিজয়-বাহিনী উত্তর-ভারত বিদলিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছে; হিন্দুর কণ্ঠে বেদগান স্তব্ধ, দেবমন্দির জনশূন্য, আতঙ্কক্ষুব্ধ, ভারতের হিন্দু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—ব্রাহ্মণই সেদিন যুগধর্ম্ম-প্রেরণায় জয়শঙ্খে ফুৎকার দিয়া হিন্দুত্ব-রক্ষায় আগাইয়া আসিলেন। বৈদিকধর্ম্ম ভারতের পুণ্যধর্ম্ম, হিন্দুজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে দৃঢ় শিকড় সঞ্চার করিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতির অজ্ঞাত ছিল, ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বৈদিকসভ্যতা ও আদর্শবাদ জনসাধারণের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন নাই; ব্রাহ্মণই ইহার জনক ও রক্ষক, অন্য জাতি ব্রাহ্মণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিলেই ভারতের আভিজাত্য রক্ষা পাইবে, এই বাণীই ক্ষত্রিয়াদি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের কণ্ঠে প্রচারিত হইত। ক্ষত্রিয় ঋষি ও আচার্য্যের আবির্ভাব যাহা লক্ষ্যে পড়ে,

তাহা ব্রাহ্মণের শাসন উপেক্ষা করিয়াই অভ্যুদয়ের পরিচয়; মূলতঃ ভারত-ধর্ম্মের সবখানি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের অধিকারে দেওয়া হয় নাই। সনাতন ভারতের সেই একই কথা আজও শুনিতে পাই। বৈদিকধর্ম্মের অনুভূতি না থাকায় ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব বাড়িতেছিল, তাহার উপর পাঠান আক্রমণে ভারতে ব্রহ্মণ্যসভ্যতা লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া, ভীমা নদীর তীরে পণ্ঢরপুরে যে পুণ্ডলিক-ভক্ত 'সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, জ্ঞানদেব তাহাদের মধ্যে গীতার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া মহারাষ্ট্রে ভক্তির প্রবাহ সৃজন করিলেন। তিনিই বোধহয় সর্ব্বপ্রথমে গীতা মহারাষ্ট্র ভাষায় প্রণয়ন করিয়া জাতি-সাধারণের মধ্যে ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। পুণ্ডলিক শ্রীবিষ্ঠল-দেবেরই নামান্তর। ইহার সঙ্গে একনাথের ভাগবত প্রচার সংযুক্ত হইয়া কীর্ত্তন ও ভজনের মধ্য দিয়া আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করা হয়। মহারাষ্ট্রের হিন্দুপ্রভাব আজও অম্লান রহিয়াছে।

ইহার পরই বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া ভক্তি-প্লাবনে উত্তর-ভারতও অভিষিক্ত হইল। যে সকল বৈষ্ণব মহা-পুরুষগণের প্রচেষ্টায় হিন্দু-ভারতে আজও হিন্দুজাতির পরিচয়-রক্ষা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দের নাম প্রসিদ্ধ।



তুকারাম

রামানন্দী-সম্প্রদায় বিশ লক্ষ লোক লইয়া সংগঠিত ; ভারতে ধর্ম্মভাবরক্ষায় এই বিপুল লোকবল সামান্য কথা নহে।

কথিত আছে, ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ পুণ্যসদন ভূরিকর্ম্মার ঔরসে সুশীলা নাম্নী মাতার গর্ভে প্রয়াগে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন রামদত্ত। অল্প বয়সেই রামদত্তের জ্ঞান-শক্তি অসাধারণ রূপে প্রকাশ পায় ; দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমেই তিনি পণ্ডিত আখ্যা লাভ করেন। প্রয়াগ হইতে কাশীধামে তিনি দর্শন-শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য আগমন করিলেন।

অধ্যাপক কাশীর বিখ্যাত একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় শঙ্কর-মত রামদত্তের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল ; তিনি অদ্বৈতবাদে অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। তাঁর অসাধারণ অদ্বৈতবাদ-ব্যাখ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ভবিষ্যতে একজন প্রধান বেদান্তা-চার্য্যরূপে দেখিবার আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাগ্য-দেবতা রামানন্দের জীবন-তন্ত্র অন্যরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

রামানুজ সম্প্রদায়ের রাঘবানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; রাঘবানন্দ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। রামদত্তকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিল, ভাগবত শরণ লও, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

কর।” রামদত্ত গুরুর নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন; কিন্তু ইহার প্রতিকার তাঁর সাধ্যাতীত, ইহাও জানাইলেন। রামদত্ত রাঘবানন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রী-সম্প্রদায়ের বিধানে রামদত্তের দীক্ষা হইল। রাঘবানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন—রামানন্দ। রাঘবানন্দ রামানন্দকে যোগশিক্ষা দেন। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সমাধি অবস্থায় উহা উত্তীর্ণ হন, পরে রাঘবানন্দের নিকট শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানোন্মেষ দেখিয়া রাঘবানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—“দীর্ঘজীবন লাভ কর।” রামানন্দের গুরুসেবায় রাঘবানন্দ পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাকে তীর্থ-পর্য্যটনের আদেশ দিলেন। রামানন্দ ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করেন; তিনি বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। কপিল মুনির আশ্রম অবধি সমুদ্রতটে কিছুদিন বাস করিয়া পুনরায় গুরুসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরু-পদ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির জন্য নহে; পান-ভোজনের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে খুবই কড়াকড়ি—রামানন্দ তীর্থ-ভ্রমণকালে এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন না। রামানুজ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত দার্শনিক-তত্ত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার-

পালনে নিষ্ঠা রাখেন নাই। সর্ব্বজীবে নারায়ণদর্শন-জনিত তাঁর হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়াছিল; সাম্প্রদায়িক গণ্ডী তিনি রাখিতে পারেন নাই, সর্ব্বশ্রেণীর জাতিকে তিনি দীক্ষাদান করেন।

রাঘবানন্দ এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া রামানন্দকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে বলেন ও শ্রী-সম্প্রদায় হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন দার্শনিক আচার্য্যগণের ধর্ম্মসম্প্রদায়মূলক যে বৈশিষ্ট্য ও ভেদ রক্ষা করার বিধান তাহা ইহাতেই শিথিল হইয়া পড়ে —ভারতের ধর্ম্মযুগের ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা। রামানন্দ হইতেই ভারতে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-গুরুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়া উঠে। ইহাতে ভারতের উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা বলা সহজ নহে। ব্রহ্মণ্য-প্রভাবও যেমন যুগপ্লাবনে ভাসিয়া সনাতন হিন্দুরাজ্যের ভিত্তিরক্ষায় সমর্থ হয় নাই, রামানন্দ-প্রমুখ বৈষ্ণবধর্ম্মিগণও জাতির মাথা উন্নতি শিখরে উঠাইয়া ধরে নাই। বাংলার ব্রাহ্মসমাজ যেমন খ্রীষ্টান-প্লাবনে বাঙ্গালীকে ভাসিয়া যাইতে বাধা দিয়াছিল, ব্যাপকভাবে ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মও তেমনি বিদেশীর আক্রমণে হিন্দুজাতিকে বিধ্বস্ত হইতে দেয় নাই। যুগের প্রয়োজন ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। জাতি-রূপে ভারতে হিন্দুর জাগরণ কোন পথ দিয়া ঘটিবে, তাহাই বর্ত্তমান যুগের বড় সমস্যা।

রামানন্দ ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই, সকল জাতিই তাঁহার নিকট তুল্যরূপে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিত। তিনিও ভারতের ধর্ম্ম কথিত ভাষায় সংগ্রথিত করিয়াছেন। রাম ও সীতার বিগ্রহ-মূর্ত্তি তিনি উপাস্য-দেবতারূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের মন্ত্র 'শ্রীরাম'। 'জয় রাম', 'জয় শ্রীরাম', 'সীতারাম' প্রভৃতি বলিয়া স্ব-সম্প্রদায়ের লোককে ইহারা অভিবাদন করে। রামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য—আশানন্দ, কবীর, রায়দাস, পীপা, সুরাসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও শ্রিয়ানন্দ। "ভক্তমালে" দ্বাদশ শিষ্যের নামের কিছু পার্থক্য আছে। রামানন্দের দুইজন নারী-শিষ্যা ছিলেন—পদ্মাবতী ও সুরাসুরী। সুরাসুরী সুরাসুরানন্দের পত্নী; ইঁহাদের পরিচয় পরে দিব।

রামানন্দ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের বৈদিক আচার, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির ভিত্তি-ভঙ্গ করিয়াছে। ইহাদের মতে—ধর্ম্ম ও ভগবানের জন্য যাহারা সর্ব্বত্যাগী, তাহাদের আচার বিচারের কড়াকড়ির কোন কারণ নাই। যাহারা সংসার, সমাজ, পত্নী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা প্রভৃতির মায়া-ডোর ছিন্ন করিয়া ভাগবত পথের যাত্রী, তাহাদের মধ্যে যদি আবার ভেদবৈষম্য রহিল, তবে

ভগবানের মানুষ হওয়ায় লাভ হইল কি? শঙ্কর ও রামানুজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মোপদেশ ব্রাহ্মণ-গুরুর কণ্ঠ হইতেই নির্গত হইয়াছে; রামানন্দ দেশভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করায়, ইহা সর্ব্বজাতির সম্পদ্-রূপে ভারতের অস্পৃশ্যজাতিকেও গুরুর আসনে অধিকার দিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে রামানন্দ প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছেন।

রামানন্দের ধর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ কাশী ও অযোধ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাশীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে মুসলমান-কর্ত্তৃক ভগ্ন-মন্দিরের যে যে প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে; তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন নাকি এখনও পরিদৃষ্ট হয়।

রামানন্দের শিষ্য-সংখ্যা কম নহে। যে দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। রামানন্দের তপঃশক্তির পরিচয় পঞ্চনদে কবীর নানকে রূপবন্ত হইয়াছে, তুলসীদাস জয়দেবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব দেশ-ভাষায় প্রচলিত করিয়া ভারতের আবালবৃদ্ধবণিতাকে তিনি ভাগবতানন্দে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

রামানন্দী সম্প্রদায়ে জাতি-ভেদ যেমন নাই, তেমনই মঠাদি-পরিচালনে ব্যক্তিবাদও তিনি রাখেন নাই; ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বজনসম্মত মতের উপরই তাঁর সকল কর্ম্ম পরিচালিত করার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাঞ্জাবে

শিখ-গুরু নানকের সংস্থাও বোধহয় এই নীতিরই পক্ষপাতী হইয়াছে।

রামানন্দী মঠ সকল পঞ্চায়তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন গৃহস্থ ও উদাসীন, এই দুই শ্রেণীর ভক্ত পরিদৃষ্ট হয়, ইঁহাদের মধ্যেও তাহাই আছে; কিন্তু উদাসীনের দ্বারাই ধর্ম্ম-বিষয়ের সমাধান হইয়া থাকে। উদাসীনেরা ভিক্ষা দ্বারাও যেমন অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে, বাণিজ্য, কৃষিবৃত্তিতেও তাহাদের বাধা নাই। রামানন্দ সন্ন্যাসীদের জীবনে এই ব্যবস্থায় জীবিকার্জ্জনের ও মঠগুলির রক্ষার অভিনব কর্ম্মবীজ রোপন করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ঔদার্য্য যেমন এক অভিনব সাহসের পরিচয় দেয়, তেমনি উদাসীনদের মধ্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি-রক্ষার এক অপূর্ব্ব বিধানও তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

রামানন্দীদের ধর্ম্মস্থান মঠ, অস্থল বা আখড়া নামে কথিত। এইগুলি গুরুদিগের বাস-ক্ষেত্র। সকল মঠেই বা আখড়ায় বিগ্রহ অথবা প্রধান গুরুর সমাধি স্থাপিত থাকে। মোহন্ত ও তাঁহার শিষ্যগণের বাসগৃহের সঙ্গে ধর্ম্মশালাও আছে; ইহাতে তীর্থ-যাত্রী, উদাসীন, বৈরাগী প্রভৃতি অতিথিরা আশ্রয় পায়। সকল মঠাধ্যক্ষ মিলিয়া একটীকে কেন্দ্র-মঠ বলিয়া স্বীকার করে; এই মঠের অধিপতি রামানন্দী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন। প্রধান

মোহন্তের দেহরক্ষা হইলে, সকল মঠের অধ্যক্ষ ও শিষ্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া নূতন মোহন্তের অভিষেক করে। দেশের রাজন্যবৃন্দও এই অভিষেক-সভায় যোগদান করিতেন প্রত্যেক মঠের জন্য কৃষিক্ষেত্র থাকে। মোহন্ত স্বয়ং তাহা লোক দিয়া কর্ষণ করাইয়া শস্য উৎপন্ন করেন, বিষয়ী শিষ্যেরাও আনুকূল্য করে। মঠাধ্যক্ষগণ বাণিজ্য দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

রামানন্দীদের দেবতা—রামচন্দ্র; কিন্তু বেদোক্ত দেবদেবী ইঁহারা অস্বীকার করেন না। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহারাও তুলসী ও শালগ্রামশিলার উপর শ্রদ্ধাবান্। রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহারাও তিলক-সেবা করেন; বর্ণ-জাতি-বিচার এই সম্প্রদায়ে নাই; ইঁহাদের উপাধি অবধূত। কুলাতীত বলিয়া ইঁহারা জাতি ও বর্ণের বন্ধন রাখা অসঙ্গত মনে করেন।

রামানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম শতদ্রুধারায় সমগ্র উত্তর ভারত, সুদূর বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করে। ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়নে তুলসীদাস, নাভাজি সুরদাস ও জয়দেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাভাজি অতি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ডোমজাতীয় ছিলেন। দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পিতামাতা তাঁহাকে অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কীল ও অগ্রদাস নামক দুইজন বৈষ্ণব-

গুরু তাঁহাকে পালন করেন ও ভাগবত মন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই নাভাজিই ভক্তমালগ্রন্থ-প্রণেতা। রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রভাবেই নীচ-কুলের মানুষ ধর্ম্মজীবন-যাপনের অধিকারী হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

সুরদাস এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ভক্তিপদ রচনা করেন। সুরদাসের মধুর সঙ্গীতে অসংখ্য ভারতবাসী ভক্তি-প্লুত হৃদয়ে ভগবানের পথে যাত্রা করে। ইঁনি সুরদাসী সম্প্রদায়ের নেতা; কাশীর এক ক্রোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে ইঁহার সমাধি-স্তম্ভ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই সুরদাসই বিল্বমঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ।

তুলসীদাস লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণে ভক্তির অঙ্কুর রোপণ করেন; ভারত-সম্রাটের অপেক্ষা তাঁর খ্যাতি অধিক ছিল। জন্মগত আভিজাত্য, সম্পদ্ ও শিক্ষার বিন্দুমাত্র প্রভাব তাঁহাকে এতখানি প্রসিদ্ধি দান করে নাই, ভক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াই তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অতি কুক্ষণে তিনি জন্মলাভ করায়, গ্রহ-ভয়ে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে পথের ধারে নিক্ষেপ করেন; একজন অবধূত তাঁহাকে পালন করেন। তাঁর নিকট হইতে তুলসীদাস রাম-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন এবং কাশীতে দেশ-ভাষায় যে অমৃত-গ্রন্থ রচনা করেন, সমগ্র হিন্দী-

ভাষাভাষী ভারতে তাহা এক অমূল্য সম্পদ্-রূপে পূজা পাইয়া থাকে।

বাংলায় জয়দেবের কণ্ঠেও ভক্তি-সুধার অনর্গল ধারায় জাতি অভিষিক্ত হইয়াছে। জয়দেবের পুণ্যকাহিনী সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর সমগ্র ভারতে দার্শনিক আচার্য্যগণের বাণী-রোধ হইলে, প্রেম-ভক্তির জাহ্নবীপ্রপাতে ভারত ধন্য হইয়াছে।

সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, ভাগীরথী-তীর ব্যাপিয়া সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সে যে কি ধর্ম্মান্দোলনের যুগ গিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মোগলরাজ্যের অবসানে ইংরাজ-সভ্যতার বিলাসবৈভবের আলোকচ্ছটায় ভারতের হিন্দু আজও যে অটল-পদে আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মূলে রামানন্দের ভক্তি-বীজের আবাদ ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে!

মহারাষ্ট্রে তুকারামের আবির্ভাব ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি বণিক্-পুত্র ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি শ্রীবিঠ্ঠলদেবের চরণাশ্রয় করেন। তাঁর কণ্ঠে সুধালহরী বহিতে থাকে। মহারাষ্ট্রে নূতন করিয়া হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস-মূলে তুকারামের ধর্ম্ম-প্রাণতা ছিল। ছত্রপতি শিবাজী তুকারামের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তি ও বিশ্বাস

সর্ব্বজাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। জ্ঞানদেব, একনাথ, রামানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাপুরুষদের প্রচেষ্টায় হিন্দুর গীতা, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি দেশ-ভাষায় প্রচারিত হওয়ায়, ধর্ম্মের আস্বাদ সর্ব্বজাতির পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ধর্ম্মবিপ্লব বটে; কিন্তু এই বিপ্লবের ভিতর দিয়াই মহাপ্রলয়-যুগে হিন্দুজাতি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে।

গীতার কর্ম্মবাদ মহারাষ্ট্রে রামদাস স্বামীর ভিতর দিয়া বিদ্যুচ্ছক্তির ন্যায় প্রচারিত হয়। তিনি মুসলমানের অধীনতা-পাশ হইতে হিন্দুজাতিকে মুক্তির বিধান দিতে সংযম শিক্ষা দেন এবং নিরন্তর নিষ্কাম কর্ম্মে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। শিবাজী মহারাজ এই মহাপুরুষের নিকটই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।

রামদাসের পূর্ব্ব নাম নারায়ণ সুরাজী তোষার। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহান্তর হয়। রামদাস "দাসবোধ" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। রামদাসী সম্প্রদায়ের ইনিই প্রবর্ত্তক। রামানন্দের পরে সমগ্র ভারতে যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া কোটী কোটী নরনারীকে ধর্ম্মের আস্বাদ দিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের কথা পরে বলিব।

* *
*



রামদাস

রামানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়

'ভক্তমালে' আশানন্দের নাম নাই; কিন্তু এই আশানন্দ হইতে খাকী সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পরে বলিব। অনন্তানন্দের চরিত্র-চিত্র ভক্তমালে' বর্ণিত আছে। অনন্তানন্দ রামানন্দের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। ইনি যোধপুরের রাজাকে রামানন্দের ধর্ম্মে দীক্ষা দান করিয়া যশস্বী হন। অনন্তানন্দের পৌত্রই ভক্তমাল গ্রন্থ-প্রণেতা নাভাদাস, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুখানন্দ কবি। "সুখসাগর" বলিয়া তাঁহার অমূল্য গ্রন্থখানি ভক্তজনের নিকট পূজা পাইয়া থাকে—ভাগবত-স্তোত্রাদিতে ইহা পূর্ণ।

সুরাসুরানন্দের ধর্ম্ম-বিশ্বাস তুলনাহীন। ইনিই রামানন্দের অন্যতমা নারী-শিষ্যা সুরাসরীর স্বামী। কোন এক মুসলমান চাতুরী করিয়া সুরাসুরানন্দ ও তদীয় শিষ্যবর্গকে পিষ্টক প্রদান করে; উহা ঈশ্বর-নিবেদনান্তে সকলে গ্রহণ করিলে উক্ত মুসলমান প্রচার করিয়া দেয়, যে সুরাসুরানন্দ সশিষ্যে গোমাংস ভোজন করিয়াছে,

অতএব উহারা আর হিন্দু নহে। শিষ্যগণ বিচলিত হইলে, সুরাসুরানন্দ বলিলেন—ধর্ম্ম এমনই নহে, যাহা পান-ভোজনে নষ্ট হইয়া যাইবে ; যদি তোমাদের একান্তই ভগবানে নিবেদিত প্রসাদ অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়, উহা বমন করিয়া নিশ্চিন্ত হও। শিষ্যগণ উদরস্থ পিষ্টক বমন করিয়া ফেলিলেন। সুরাসুরানন্দ পিষ্টক বমন করিলে দেখা গেল, গোমাংস তুলসীপত্রে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মনাশের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ করিয়া তিনি হিন্দু-সমাজে একজন খ্যাতনামা সাধু-রূপে সর্ব্বত্র পূজ্য হন।

মহানন্দ, পরমানন্দ, শ্রিয়ানন্দ সম্বন্ধে ভক্তমালে কোনরূপ আখ্যায়িকা নাই। ইহার পরিবর্ত্তে নরহরি আনন্দের কিছু বর্ণনা আছে। একদিন একদল সাধুর রন্ধনের কাষ্ঠাদির অভাব হয়। নরহরি কোন দেবীর মন্দির হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করেন। দেবীর আদেশ হয়, যে নরহরি যত কাষ্ঠ চাহিবে, দেবী স্বয়ং তাহা প্রদান করিবেন। এই কথা জানিয়া অন্য এক ব্যক্তি এই মন্দিরে কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য উপস্থিত হয় ; কিন্তু দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন। প্রভাতে এই ব্যক্তির মৃতদেহ সকলে প্রত্যক্ষ করে। পরে নরহরি আজীবন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে, এই আদেশ দিয়া দেবী তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। ইহা হইতেই নরহরি আনন্দের মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়।

পিপা রাজপুত। তিনি গাঙ্গোরোল নামক স্থানের রাজা ছিলেন, শক্তির উপাসনা করিতেন। একদিন কোন বৈষ্ণব অতিথিকে তিনি অশ্রদ্ধার সহিত খাদ্যদ্রব্য দান করেন। অতিথি রাজার অন্তরে: কৃষ্ণভক্তি-সঞ্চারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, রাত্রিকালে শঙ্খিনী-যোগিনী সহ স্বয়ং ভবানী ভয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া রাজার বক্ষস্থল চাপিয়া বসিলেন, ক্রোধভরে বলিলেন—'মূঢ়, আপনাকে সাধু মনে করিয়া কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের অপমান করিয়াছ; প্রাতঃকালে উঠিয়াই তাঁহাকে সম্মান দিবে, নতুবা তোমার পরিত্রাণ নাই।'

পিপা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া বৈষ্ণবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, করযোড়ে কহিলেন—'আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, কৃষ্ণভক্তি যাহাতে হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ দিন।'

বৈষ্ণব-সাধু তাঁহাকে রাজৈশ্বর্য্য দরিদ্রকে দান করিয়া কৃষ্ণভক্তির সাধনে উপদেশ দিলেন। রাজা দেবীর নিকট সে কথা জানাইলেন। দেবী আদেশ করিলেন—'কাশীতে রামানন্দের নিকট দীক্ষা লও।' পিপা কাশীতে আসিয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। রামানন্দ তাঁহাকে অবৈষ্ণব জানিতেন; এইহেতু দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন—বার বার অনুরুদ্ধ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কূপে পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ দিলেন। পিপা মরণপণ করিয়া রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন,

তিনি অকুণ্ঠচিত্তে গভীর কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অতি কষ্টে রামানন্দ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়া তারকব্রহ্ম-রাম নামে তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

রাজার সাত রাণী তাঁহার অনুগামী হইতে চাহিল; রামানন্দ তাঁহাদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কেহই প্রবোধ মানিল না। পিপা বলিলেন—'যে আমার সহিত আসিতে চাহে, অলঙ্কার বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্ন-বেশে সভায় উপস্থিত হও।' সকলে লজ্জায় অধোবদন হইল; ছোটরাণী সীতাদেবী গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি মোচন করিয়া করুণ বচনে বলিলেন 'গুরুর সম্মুখে উলঙ্গ-মূর্ত্তি তাঁর সম্মান-লাঘব করিবে।' একটী ছিন্ন কম্বল কটিতটে জড়াইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। পিপা রামানন্দের দিকে চাহিলেন, তিনি বলিলেন—'স্বামী-স্ত্রীর অনুরাগ যদি ভগবানে জন্মায়, তবে দৈহিক সম্বন্ধে তাহাদের অভিমান থাকে না, পুরুষ ও স্ত্রী অভেদ হইয়া যায়—ইহাকে তুমি সঙ্গে লও।'

সীতা সাধ্বী পত্নী। স্বামীর সহিত তীর্থ-পর্য্যটনে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। নারী ধর্ম্মপথের বাধা না হইয়া পরম সহায় হইতে পারে, তাহা পিপার জীবনে প্রমাণিত হয়। বহুবার সতীত্বরক্ষায় তাঁহাতে দৈবীশক্তির প্রকাশ হয়; সে সব কাহিনী এই ক্ষেত্রে না বলিলেও চলিবে।

ভবানন্দের কোন কাহিনী পাওয়া যায় না; তবে তিনি যে রামানন্দের একজন শিষ্য ছিলেন, ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই।

ধন কৃষক ছিলেন। জাতিতে জাঠ। কোন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ধনের অতিথি হন। বীজ, শস্য ব্যতীত অন্য কিছু আহার্য্য তাঁহার ঘরে ছিল না, তাহা দিয়াই তিনি সন্ন্যাসীর সৎকার করিলেন। সঞ্চিত বীজ নিঃশেষ হইলে তিনি পিতামাতার নিকট পাছে তিরস্কৃত হন, এই আশঙ্কায় মাঠে যথারীতি লাঙ্গল দিয়া বীজ-বপনের ভাণ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। পিতামাতাকে কোন কথা বলিলেন না। যাহারা ইহা দেখিয়াছিল, তাহারা ধনের মূর্খতা দেখিয়া হাসিয়াছিল; কিন্তু যথাসময়ে অন্য সকলের অপেক্ষা ধনের ক্ষেত্রে অধিক শস্য জন্মিল—ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল।

কোন ব্রাহ্মণকে শালগ্রামশিলা পূজা করিতে দেখিয়া তাঁহার মনেও এইরূপ পূজার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। তিনি শালগ্রামশিলা প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে শালগ্রাম দিল না। তখন তিনি এক প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র বোধে নিত্যপূজা আরম্ভ করিলেন। ধনের অকপট বিশ্বাসে প্রস্তরখণ্ডেই ভগবান প্রকট হইলেন। ধন দেখিল, যখন সে মাঠে লাঙ্গল দিতে যায়, তখন একজন জাঠ তাহার সাহায্য করে, সে তাহার

পরিচয় জানে না। ধনের শস্যক্ষেত্র স্বর্ণপ্রসূ হইল। একদিন এই জাঠ বন্ধুই তাহাকে কাশীতে রামানন্দের নিকট দীক্ষা লইতে উপদেশ দেন। ধন রামানন্দের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দিব্যচক্ষু পাইলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সহচরকে স্বয়ং রামচন্দ্রজী-রূপে চিনিতে পারিয়া তাঁর পদতলে নতশির হইলেন। রামচন্দ্রজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। ধন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না, ভগবানের আরাধনায় দিব্যজীবন লাভ করিলেন।

সেন জাতিতে নাপিত। সেনপন্থী বলিয়া এক সম্প্রদায় ব্যতীত ইহার অন্য কোনরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। গণ্ডোয়ানার অন্তঃপাতী বন্ধগড়ের রাজবংশের সেন ও তাঁহার বংশধরেরা কুলগুরু হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সেন বন্ধগড়ের রাজার কুল-নাপিত ছিলেন। বৈষ্ণব-সহবাসেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। রাজার ক্ষৌরকর্ম্মের সময়ে তিনি একদিন এমনই ভাগবত প্রেমে বিহ্বল হইলেন, যে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। স্বভাব-চেতনা ফিরিয়া আসিলে, সেন দ্রুত রাজসমীপে উপনীত হইলেন; কিন্তু রাজার ক্ষৌরকর্ম্ম তখন সমাপ্ত হইয়াছে। সেন নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি যদি

ক্ষৌরকর্ম্ম কর নাই, তবে কে আমার ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গেল ?”

সূক্ষ্মদর্শী রাজা বুঝিলেন—সেনের ছদ্মবেশে যিনি ভক্তের বোঝা বহিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষৌরকর্ম্ম-সময়ে এক অপূর্ব্ব সৌরভে তিনি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা নিজেরই অঙ্গ-গন্ধ মনে করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। অতঃপর সেনের পদতলে পড়িয়া রাজা নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। ভগবানের এমন ভক্তকে তিনি আর নাপিত করিয়া রাখিলেন না, গুরুর আসনে বসাইলেন। ইহা হইতেই সেন-পন্থীর উদ্ভব। সেন রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন।

রায়দাস চামার ছিলেন। ভারতে রামানন্দ ভাগবতভক্তি প্রচার করিয়া যেন সত্যই প্রমাণ করিয়াছেন, যে ভাগবত-ভক্তি যে ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হউক তাহা দিব্য ও পবিত্র, অস্পৃশ্য বলিয়া ভেদ সেখানে থাকে না। রায়দাসের জীবন-চরিত্র ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কথিত আছে—রামানন্দের কোন এক ব্রহ্মচারী শিষ্য মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা গুরুসেবা সমাপন করিত। একদিন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টিতে বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারী “চাটকি” না করিয়া এক ধনকুবের বণিকের সিধা গ্রহণ করিলেন। রামানন্দ যথাকালে তাহা ভগবানকে নিবেদন করিয়া অনুভব করিলেন, যে নিবেদিত অন্নে অন্তর্য্যামী প্রসন্ন

হন নাই; বিরক্ত হইয়া সেদিনের ভিক্ষা কিরূপে সংগ্রহ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী সত্য কথা বলিলে, রামানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'মুষ্টিভিক্ষা ছাড়িয়া স্থূলভিক্ষায় তোমার ব্রতভঙ্গ হইয়াছে, দেবতা অপ্রসন্ন হইয়াছেন—অতএব তুমি অচিরাৎ নীচকুলে জন্মগ্রহণ কর।"

পূর্ব্ব জন্ম ও কর্ম্মের গুণে জাতি ও কুলের উৎপত্তি। এই ব্রহ্মচারী দেহপাতে মুচির বংশে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু ক্ষেত্র উচ্চ নীচ হইলেই জীব যে তদনুযায়ী হইবে, তাহার কোন কথা নাই—রায়দাসের জীবন তাহার প্রমাণ। মুচি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল না; ইষ্ট-বিচ্ছেদে তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দুগ্ধপানে বিরত হইলেন। মুচি নবজাত সন্তানের অবস্থা দেখিয়া ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইল। রামানন্দ স্বীয় অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইলেন, তিনি স্বয়ং মুচির গৃহে যাইতে চাহিলেন। মুচি বলিল—'আমার ঘরে আপনি কেমন করিয়া যাইবেন, আমি যে অস্পৃশ্য।' রামানন্দ হাসিয়া বলিলেন—'জীবের উপকার ও সেবায় স্বয়ং নারায়ণ পরিতুষ্ট হন।' রামানন্দ শিশুর নিকট উপস্থিত হইলে, রায়দাসের দুই নয়ন দিয়া ধারা ঝরিয়া পড়িল; রামানন্দ সাগ্রহে তাহার কর্ণে মহামন্ত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রায়দাস শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেন.

তিনি প্রতিদিন দুই যোড়া জুতা প্রস্তুত করিতেন। হরিভক্তকে এক যোড়া দান করিয়া, অন্য যোড়া বিক্রয় করিয়া তিনি যে অর্থ পাইতেন, তাহাতেই তাঁর জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার স্বভাব অন্য হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি কুটুম্বদের সহিত ভিন্ন হইয়া পড়িলেন, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন—ভাগবত সেবায় ঘোরতর দারিদ্র্য-দুঃখ বহন করিয়া তিনি পরমানন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া একদিন ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তোমার জন্য স্পর্শমণি আনিয়াছি, গ্রহণ কর।' রায়দাস বলিলেন, 'তোমার পরিচয় কি?' ভগবান কহিলেন, 'আমি তোমার ইষ্ট স্বয়ং রঘুবর।'

রায়দাস তাঁহার দিকে অনিমিষে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহাই হইবে, এই পাথর দিয়া আমায় ভুলাইতে চাও কেন? তোমার স্বরূপ দেখাও।' নারায়ণ কহিলেন, 'অগ্রে এই মণি গ্রহণ কর, পরে নিজ রূপ দেখাইব।' রায়দাস তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। পরশমণি রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, রায়দাস চালের বাতায় তাহা গুঁজিয়া রাখিলেন।

রায়দাসের চিত্ত তখন প্রেমানন্দ-রত্নে মুগ্ধ হইয়াছিল, প্রাকৃত সম্পদের দিকে দৃষ্টি তাঁর ছিল না। সদানন্দ বৈরাগী রায়দাস ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা অষ্টাদশ সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, স্পর্শমণি তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল না।

ভগবান পুনরায় ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন। রায়দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'স্পর্শমণি চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছ, দারিদ্র্য-দুঃখ অকারণ ভোগ করিতেছ; যদি স্পর্শমণি না গ্রহণ কর, তোমার ইষ্ট-বিগ্রহের আসন-তলে প্রতিদিন পাঁচটী করিয়া মোহর পাইবে—তাহা দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিও।' রায়দাস স্পর্শমণি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের আসন উঠাইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তখন তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, 'আমায় মায়ায় বাঁধিতে তুমি কে আসিয়াছ!' তিনি বলিলেন, 'আমি স্বয়ং রামচন্দ্র।' রায়দাসের প্রার্থনায় তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রায়দাস বিদ্যুতের ন্যায় সে মনোহর রূপ দেখিয়া উন্মাদ হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পীতাম্বর নবঘন শ্যামসুন্দরের অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁর সবখানি ভরিয়া গেল; কিন্তু দর্শন বিহনে তাঁহার হৃদয় মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বিলাপ করিতে করিতে ভাবিলেন—প্রভুর বাক্য পালন না করায় বুঝি

তিনি মুহূর্ত্তের দর্শন দিয়া তিরোহিত হইলেন। অতঃপর স্বর্ণ লইয়া কি করিবেন, তিনি অনেক চিন্তা করিলেন; শেষে দেবমন্দির-নির্ম্মাণ ও সেবার শৃঙ্খলা বিধান করিয়া বৈষ্ণবের মেলা বসাইয়া দিলেন। রায়দাসের প্রাসাদ-সাদৃশ ভবনে মহোৎসব আরম্ভ হইল।

ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের গৌরববর্দ্ধনের জন্য স্বয়ং ভগবান বিপক্ষতা সৃষ্টি করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজ রায়দাসের কীর্ত্তি দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা রাজার নিকট অভিযোগ আনিলেন, 'নীচ অস্পৃশ্য রায়দাসের গৌরবে ব্রাহ্মণের মহিমালাঘব হইতেছে; এইরূপ অধর্ম্ম মাথা তুলিলে রাজ্যে ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। হে মহারাজ, ইহার প্রতিকার করুন। মুচি শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিয়াছে। দেশের অসংখ্য নারী পুরুষ আজ তাহার ভবনে নির্ভয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জাতি নষ্ট করিতেছে—তাহাকে দেশান্তরিত করা হউক।'

রায়দাসের জীবনে অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাজা দূত প্রেরণ করিয়া শালগ্রামশিলা পরিত্যাগ করার জন্য রায়দাসকে আদেশ দিলেন। রায়দাস রাজসভায় আসিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণগণের হস্তে ইহা অর্পণ করিব।' সকলে তাহাতে সম্মত হইলে, রাজার সিংহাসনে রায়দাস নিজের ইষ্ট-বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা নানামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ; স্তুতি, স্তব, বেদধ্বনি কিছু বাকী থাকিল না ; কিন্তু শিলা কেহই, উঠাইতে পারিলেন না। পরিশেষে, রায়দাস দেবতাকে আহ্বান করা মাত্র, তিনি তাঁহার বক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাজা রায়দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে নিষেধ করিলেন। রায়দাসের মহিমা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিতোরের রাজ-মহিষী ঝালী রায়দাসের অপূর্ব্ব মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিলেন। তার্কিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন। সুবুদ্ধি রাণী বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আজন্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, নিজের বন্ধন মুক্ত করিতে পার না ; অধর্ম্মের ভয়ে অধর্ম্মের যজনা করিয়া পাপভারেই পৃথিবী ভরাইয়া তুলিতেছ। শাস্ত্র দূর হোক্। অন্তরে যুক্তি করিয়া বুঝিয়া দেখ, পরাৎপর জগন্নাথ পরম ঈশ্বরকে যে হৃদয়ে পায়, সে নীচ নয়। পবিত্র ব্রাহ্মণজাতিও কর্ম্ম-গুণে নীচ কুলেতে জন্মিতে পারে ; কিন্তু হরিভক্তি একবার জন্মিলে তাহার আর অধোগতি হয় না। অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল হইলেও, ভুবন-পাবন-রূপে সে সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বশাস্ত্রে ইহা কথিত আছে।'

ঝান্সী রাণী রায়দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাণী ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, ভোজনে বসাইলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, এক পঙক্তিতে রায়দাস বসিয়া ভোজন করিতেছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন; তবুও দেখিলেন, রায়দাস সেখানেও বসিয়া আছেন, পুনঃ পুনঃ তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিয়া ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন, সর্ব্বত্রই রায়দাসকে দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রাণী তখন সহাস্যে মুচি রায়দাসকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, রায়দাসের অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার বামস্কন্ধে স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; কিন্তু সংস্কার-বশে তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভারতের জ্ঞানমার্গ ভক্তিহীন মরুভূমি; তাই আজ ঈশ্বরচৈতন্যহারা জাত্যভিমানবদ্ধ ক্লীব আমরা, ভারতের জ্ঞান যদি ভক্তিমিশ্রিত হইত, তবে শক্তির বিদ্যুৎ-প্রভাবে ভারতের মহিমা আজ মলিন মূর্ত্তি ধরিত না।

রামানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায় নানা ক্ষেত্রে শতদ্রু-শাখার ন্যায় ভাগবত বন্যায় ভারত প্লাবিত করিয়াছিল। আমরা কবীরের জীবন-কথা চিত্রিত করিয়া তাহার সামান্য

পরিচয় দিব। জাতি, বর্ণ, সমাজ—এই সকলই ভাগবত চেতনাযুক্ত ভারতের ভবিষ্য জাতির নিকট যে ম্লান ও তেজোহীন, তাহার আভাসই রামানন্দের জীবনধারায় প্রকট হইয়াছে।

*　　*
*

কবীর, দাদু

রামানন্দের শিষ্য আশানন্দ, আশানন্দের শিষ্য কৃষ্ণদাস। কীল নামক এক বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। কীল খাকী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ইঁহাদের আচার বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায়; ইঁহারা অঙ্গে বা পরিধেয় বস্ত্রে ভস্ম অথবা মৃত্তিকা লেপন করেন। রাম ও সীতা, এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। শৈবদের ন্যায় ইঁহারাও মাথায় জটাভার ধারণ করেন। অযোধ্যার নিকট হনুমানগড়ে ইঁহাদের প্রধান কেন্দ্র। জয়পুরে খাকী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কীলস্বামীর আসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

"ভক্তমাল"-প্রণেতা নাভাজী কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কীলস্বামী মলূকদাস নামক এক ব্যক্তির গুরু বলিয়া প্রখ্যাত; এই মলূকদাস হইতেই মলূকদাসী নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মলূকদাস জীবিত ছিলেন,

এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী করামাণিকপুর নামক স্থানে মলূকদাস বাস করিতেন ; এখানে মলূকদাসীদের প্রধান মঠ সংস্থাপিত আছে। মলূকদাসী সম্প্রদায় রামানন্দীদের ন্যায় উদাসীন গুরুর শিষ্য নহেন, গৃহস্থ-গুরুর নিকট উপদেশ ও মন্ত্র লইয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাদের উপাস্য দেবতা। ভগবদ্গীতাই প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। মলূকদাস প্রণীত হিন্দী-ভাষায় লিখিত "দশরতন" নামক গ্রন্থও বিশেষ ভক্তি-সহকারে পঠিত হইয়া থাকে।

কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথক্ষেত্রে ইঁহাদের মঠ আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে মলূকদাস দেহ রক্ষা করেন।

কবীর রামানন্দের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। রামানন্দী-সম্প্রদায়ের মধ্যে কবীরের স্থান সর্ব্বোচ্চে। রামানন্দ হিন্দুজাতির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। কবীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে উদ্যোগী হওয়ায়, ভারতের এই উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই তাঁহার প্রতিষ্ঠা অটুট হইয়াছে, কবীর হিন্দু ও মুসলমানের নিকট তুল্য ভাবেই পূজা পাইয়াছেন—ইহা অতিশয় গৌরবের কথা।

কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। কথিত আছে, কোন

এক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার পিতা রামানন্দের নিকট কন্যাসহ উপস্থিত হইলে, তিনি এই পতিহীনা যুবতীকে "পুত্র লাভ কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যথাকালে ঐ অবীরা কন্যা সন্তান প্রসব করেন; কিন্তু লোকাপবাদ-ভয়ে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে পথপার্শ্বে পরিত্যাগ করিয়া যান; এক জোলা-দম্পতি কবীরকে প্রতিপালন করে।

কবীর আজীবন বারাণসীর উপকণ্ঠে তাঁতের কাজেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। কবীরকে অনেকে মুসলমান বলিয়া মনে করিত; ইহাতে তিনি মুসলমান-সমাজেও প্রতিপত্তি পাইতেন। এই সুযোগে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে ধর্ম্মমতে উদ্বুদ্ধ করায় সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না; সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তাহাও মানিতেন না। অনশন, ভিক্ষাব্রত, ষড়্দর্শনের সিদ্ধান্ত এই সকলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেন। কবীরের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁর সকল সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল।

হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান ও অন্ত্যজ জাতির পক্ষে দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু কবীর এই পাষাণ-দ্বার ভঙ্গ করিয়াছেন—ধর্ম্মকে তিনি হিন্দু অথবা মুসলমান সাম্প্রদায়িক শিলমোহর আঁটিয়া বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেন নাই, তাঁর ভাস্বর ভাগবত বিশ্বাস সনাতন ধর্ম্মের আভাস দিয়াছে। দেশ-

জাতি-প্রকৃতি-ভেদে যে আচার অনুষ্ঠান, তাহা অতিক্রম করিয়া কবীর ধর্ম্মের অমর আস্বাদে ভারতবাসীকে ধন্য করিয়াছেন।

কবীর স্বয়ং অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভজাত হইলেও, সমাজধর্ম্মে তিনি পতিত। আবার জোলা জাতীয় পিতা-মাতার নিকট লালিত পালিত হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে হিন্দুত্বের বীর্য্য নিষ্প্রভ হয় নাই। ধর্ম্মলাভের জন্য তদানীন্তন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ রামানন্দের কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। একদিন অকস্মাৎ প্রাতঃস্নানে আসিয়া রামানন্দ কবীরের অঙ্গে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "রাম রাম"। এই পাবন মন্ত্রে কবীরের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, তিনি রামানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন—"প্রভু, আমি দীক্ষা পাইলাম, আশীর্ব্বাদ করুন।" রামানন্দ কবীরের বিশ্বাস ও ভক্তিদর্শনে প্রীত হইলেন এবং এই ঘটনা হইতে তিনিও অধিকতর উদারচিত্তে ধর্ম্মবিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হইলেন। রামানন্দ ও কবীরের মিলন-ব্যাপার ভারতের ধর্ম্মেতিহাসের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

কবীর মন্ত্র-জপে তন্ময় হইয়া হৃদয়-কমলে ইষ্টের ধ্যান ও ধারণায় তপঃনিরত হইলেন। যথাকালে বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রকাশ হইল, তাঁর কণ্ঠে নূতন বেদের ঋক্ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"গর্ভে থাকিয়া কেহ বেদ পড়ে

নাই, মুসলমান হইয়া কেহ জন্মায় নাই, একই বংশে সকলের জন্ম হইয়াছে, এক প্রাণ সকলকে সজীব রাখিয়াছে, এক জননী হইতে জগৎ উৎপন্ন—যে জ্ঞান আমাদের পৃথক্ করে সে কিরূপ জ্ঞান ?”

কবীরদেব উদাত্ত কণ্ঠে বলিলেন—“আমরা আলি ও রাম উভয়ের সন্তান। পূর্ব্বে হরির পুরী, পশ্চিমে আলির, কেহ হৃদয়-পুরীর সন্ধান করে না—রাম-রহিম দুজনেই তথায় বিদ্যমান। যাহারা তিব ও বেদের মর্ম্ম না জানে, তাহারাই মিথ্যা বলে, সেইখানেই ভেদ।”

হিন্দু মুসলমানে ঐক্যস্থাপনের এই দিব্য প্রয়াস একেবারেই সেদিন ব্যর্থ হয় নাই, তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবেই কষাঘাত করিতেন। তাঁর কথা, গলায় পৈতা দিলেই যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তবে স্ত্রীলোকদের সে অধিকার দাও না কেন! আবার মালাজপ, মসজিদের অভিবাদন, আচমনাদিতে যদি খোদা পরিতুষ্ট হন, তবে নারীকে তাহা হইতে বঞ্চিত কর কেন ? হিন্দু করে একাদশী, মুসলমানের রমজান, আর সব মাস ও দিন কি ভগবানের নয়! ঈশ্বর যদি শুধু মন্দিরে মসজিদে, তবে এই বিশ্ব-নিকেতন কাহার ? রামকে প্রতিমার মধ্যে কে দেখিয়াছে, কোন্ তীর্থে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে ? এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রাম যাঁর নাম, তিনিই আমার গুরু, আমার পীর।”

কবীরের উক্তি ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত করিয়াছিল। গোরক্ষপুরের নিকটস্থিত 'মঘর' নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কবীরদেবের মৃতদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বাধে। তাঁহার অর্দ্ধেক দেহ হিন্দুরা দাহ করিতে চাহে, অপরার্দ্ধ মুসলমানের কবর দিবার চেষ্টা করে; পরিশেষে তাঁহার মৃতদেহের আবরণ উঠাইয়া সকলেই দেখে—রক্তমাংসের দেহ নাই, আছে সুরভি-কুসুমের রাশি! মুসলমান উহার অর্দ্ধেক লইয়া 'মঘরে' সমাধি দিল। হিন্দু অপরার্দ্ধ বারাণসীতে কবীরচৌরায় ছাই করিল। 'মঘর' কবির-পন্থী মুসলমান-দের প্রধান স্থান। কাশীধামে হিন্দুদের "কবীর চৌরা" একটী মহাতীর্থ। মধ্যপ্রদেশে ছত্রগড়ে আর একটী চৌরা আছে। কবীরদেবের প্রধান শিষ্য ধর্ম্মদাস ইহার স্থাপয়িতা।

ধর্ম্মদাসকেই কবীরদেব যে সকল উপদেশ দেন, তাহাই তাঁহার অপর এক শিষ্য শ্রুতগোপাল সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ করেন।

কবীরপন্থীরা এক্ষণে নানা ভাগে বিভক্ত, তবে তাঁর দ্বাদশ জন শিষ্যের নামই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রুতিগোপাল দাস "সুখনিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার শিষ্যপরম্পরা দ্বারা বারাণসীর চৌরা, 'মঘরে'র শ্রীক্ষেত্র ও দ্বারকার আখড়া সুরক্ষিত হয়।

জগদাস "বীজক" গ্রন্থের রচয়েতা। এই গ্রন্থ ছয়শত চুয়ান্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার শিষ্যগণ এক্ষণে ধনৌতি নামক স্থানে বাস করেন।

ধর্ম্মদাস গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র —নারায়ণ দাস ও চুরামন দাস। নারায়ণ দাসের বংশ-লোপ হইয়াছে, চুরামন দাসের বংশাবলী এখনও চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই বংশ গ্লানিযুক্ত হওয়ায় উপস্থিত সমাজভ্রষ্ট।

জগদাসের গদী কটকে। জীবনদাস বিখ্যাত সৎনামী-সম্প্রদায়ের নব প্রবর্ত্তক। কমাল বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, অনেকে ইহাকে কবীরের পুত্র বলিয়া মনে করেন। টাকশালী বরদা নামক স্থানে কবীরের শিষ্য বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী মহাগ্রামের নিকট মঝ্নি গ্রামে অবস্থান করিতেন। নিত্যানন্দ ও কমলনাথ দক্ষিণাপথে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

কবীরের প্রভাব দাদু, মালয় প্রদেশের বাবালাল, শিবনারায়ণ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সৎনামী সম্প্রদায় আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে কবীরের শিষ্য জীবনদাস কর্ত্তৃক ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পর ঘাসিদাস এই সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে জাগ্রত করিয়া তুলেন। কবীরের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব দাদু

ও রামাৎ বৈষ্ণবরামচরণ-প্রবর্ত্তিত রামসানহী সম্প্রদায়ের দ্বারা বহুল ভাবে প্রচারিত হয়।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দাহু জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, দাহু ব্রাহ্মণসন্তান। তাঁহার পিতা লোচিরাম শাস্ত্র ও দেবসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে ব্যবসা করিতেন। দাহুর জন্মস্থান অহ্মেদাবাদ; কিন্তু দাহু ধুনুরীর কাজ করিতেন। কবীরপন্থীদের গুরুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি অন্য কোন প্রকার অন্ত্যজ জাতি ছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

দাহু জন্মগ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই সমগ্র জগতে ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপে খৃষ্টানধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। উত্তর ভারত, বাংলা হইতে পাঞ্জাব, দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। কবীর-পন্থীরা এই সময়ে কাশীতে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত। পঞ্জাবে গুরু নানক পৌত্তলিকতা ও নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। দাহু এই সঙ্গে নিজের ধর্ম্মমত প্রচার আরম্ভ করিলেন। আহ্মেদাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত স্থানসমূহ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে ক্ষেত্র হইল। আকবরের রাজত্বকালে দাহু বর্ত্তমান ছিলেন, আকবরের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ে

অনেক আলাপ হইয়াছিল। জয়পুরের রাজধানী অম্বরেও দাহু কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। অম্বর হইতে বিশ ক্রোশ দূরে নারিনায় তিনি শেষ জীবনযাপন করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে দাহু দেহরক্ষা করেন। দাহু দৈববাণী লাভ করেন, ইহার পরই নারিনা হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে বহরণ পর্ব্বতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাব অবস্থিতির আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। দাহু-পন্থীদের ধারণা, তিনি এই স্থানে ভগবানে লীন হইয়া গিয়াছেন।

দাহুর অসংখ্য শিষ্য হইয়াছিল; তিনি তন্মধ্যে ১৫২ জনকে তাঁহার ধর্ম্মমত-প্রচারের জন্য নিয়োগ করেন। হিন্দুধর্ম্মের অনেক ভাব ও আদর্শ যেমন তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আবার অনেক কিছু বর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা করেন নাই। বেদ ও কোরাণ অভ্রান্ত বলিয়া দাহু স্বীকার করেন নাই, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপর দাহুর আস্থা ছিল না; ধর্ম্মানুষ্ঠান, পৌরহিত্য, জাতিভেদ, প্রতিমা পূজা, মালাজপ প্রভৃতির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নাই। দাহু বলিতেন, মানুষ একই জন্মে সকল জন্মের উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করিতে পারে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই দেবতাত্রয় মানুষ, ইতিহাসের মত ইঁহাদের মূর্ত্তিপূজা কেবল আলোচনা ও স্মরণের জন্য, ইহাতে অন্য ফল নাই। মানুষ বিপথে চলিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে

অপসারিত হয়; কিন্তু সংসার বা সাংসারিকত্ব অবিদ্যা নহে। দাদু নিজেকে হিন্দু অথবা মুসলমান কোন নামেই অভিহিত করিতেন না, নিজেকে ঈশ্বরভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন।

দাদু যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহার নাম "বাণী"। প্রায় পঞ্চসহস্র কবিতায় এই বাণী লিখিত। পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখার উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ রাম-নাম উপাসনার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেও, বেদান্ত-মতাবলম্বীদের ন্যায় দাদু-পন্থীরা রামকে পর-ব্রহ্ম জ্ঞানে তাঁর নির্গুণ স্বরূপের উপাসনাই করেন, কোন প্রতিমা বা মন্দির নির্ম্মাণ করার ইহারা বিরোধী। দাদুর কথা—"হে জগদীশ্বর, তুমিই কর্ত্তা। যাহা কর তাহাই হয়, তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ নাই।"

রামানন্দের পর ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য এই সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ অসাধারণ উৎসাহে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক পরিমাণে ইহাতে সফলকাম হইয়াছেন। নানা বিরুদ্ধ ভাব ও আদর্শের প্লাবনে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রত্যয় যে লোপ পায় নাই, তাহার মূল কারণ, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ধারাবাহিক ভাবে ভারতে অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ পক্ষ-

পাতিত্ব না রাখিয়াও ভারতের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায় এই সকল সাম্প্রদায়িক গুরুগণের জীবনে অনুধাবনযোগ্য। ইস্‌লামপ্রভাবে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান একপ্রকার লোপ পাওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল! সোমনাথের মন্দির মামুদ গজ্‌নীর মুদ্গরাঘাতে তখন চূর্ণ হইয়াছে; শ্রীশৈল ধ্বংসাবর্ত্তে, আলতামাসের রোষাগ্নিতে উজ্জৈয়িনীর মহাকাল ঝলসিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে। অমরেশ্বরকে প্রাণপণে রক্ষা করায় হিন্দু সম্প্রদায় উদ্যত; নর্ম্মদানদীর তীরে ওঙ্কারনাথের সাড়া নাই; বৈদ্যনাথ, রামেশ্বর, নাসিকের ত্র্যম্বকেশ্বর, কাশীর বিশ্বনাথ, হিমালয়ে কেদারনাথের আসনও টলিয়াছে। এই অবস্থায় যে সকল মহাপুরুষ হিন্দুর তীর্থ, পর্ব্ব, দেবপূজা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বিপৎসঙ্কুল হওয়ার যুগে হিন্দুর ভাব জীবনের আচার-যোগে, সঙ্গীতে, উপাসনার মন্ত্রে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের যুগ-গুরু বলিয়াই প্রণাম করিতে হয়। অসংখ্য মহাপুরুষের আবির্ভাবকাহিনী উত্থাপন করিলে মহাভারত লিখিতে হয়। জাতির সংরক্ষণ ও গঠনের সঙ্কেত এই সকল যুগ-গুরুগণের জীবনে বিশদ রূপে প্রকটিত—পাঠকবর্গের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আজ এই সকল সম্প্রদায় উদ্দেশ্য-হারা, লক্ষ্যচ্যুত; তাঁহারা গ্রন্থ ও গুরুর পূজায় সম্প্রদায়ের মর্য্যাদারক্ষায় যত্নবান্—কিন্তু

ভারতের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যে যুগে যুগে নব নব ছন্দে ধর্ম্মজীবনের ধারানিরূপণ, তাহা বিস্মরণ হইয়াছেন। উদীয়মান জাতিকে সেই দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।

*　　　*
*



বল্লভাচার্য্য

বল্লভাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য

ভারতে যে প্রাচীন জাতি এক অভিনব অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে আত্মচৈতন্য উন্নীত করিয়া জগৎ-সমস্যার মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, অমৃতের পুত্র বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়াছিল, সে জাতি মরিতে পারে না। স্বার্থ ও অহংকারের ক্ষেত্রে জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না; অপ্রাকৃত অভাবনীয় জগতে উঠিয়াও তাহার প্রতীকার ও সর্ব্বপ্রকার জীবনসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়—এই হেতু জীবনের ভিত্তির উপর তাহা সিদ্ধ করার একটী অবিছিন্ন ধারাবাহিক ইতিহাস ভারতের ধর্ম্মগুরুগণের জীবনদৃষ্টান্তে পরিলক্ষিত হয়।

বেদের ঋক্‌মন্ত্র অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা-পূর্ণ করার যে প্রয়াস তাহা আমাদের স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির পরিচয়। ব্যবহারিক জগতের দাবী ও তাহার পূরণ-নীতির মূলে অলৌকিক রহস্য ও নিগূঢ় কারণ থাকেই, তবে তাহা জগতের সহিত একান্ত সম্পর্কশূন্য নহে। পৃথিবীর ভোগ ও সুখ অনিত্য বলিয়া জাগতিক জীবনকে তুচ্ছ করিলে,

বেদের সূক্ষ্মতম অর্থ জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে না। প্রত্যক্ষ জীবনরহস্যের মূল কারণ অন্বেষণ করার স্পৃহাই ভারতের প্রাচীন জাতির প্রাণে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে আলোকে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল। পরিদৃশ্যমান জগতের উপর হইতে মানুষের দৃষ্টিটা অন্তরের দিকে অকস্মাৎ ঘুরাইয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আহার, নিদ্রা, মৈথুন রূপ স্বভাবের ক্ষেত্র হইতেই তাহাদের দৃষ্টি শনৈঃ শনৈঃ উপরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, নীল কটাহ সীমাহীন আকাশ, জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ, নক্ষত্র, নব উষার অরুণালোক তাঁহাদের হৃদয়ে অভাবনীয় ভাব ও অনুভূতির উন্মেষ করিয়াছিল। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যখন ভীষণ ও অবারণীয় হইয়া দেখা দেয়, মানুষ তখন সাধ্যের বাহির হইতে শক্তিলাভে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অনাবৃষ্টি, মহামারী, প্রবল শক্তির আক্রমণ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার বাধা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতেই বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দের আরাধনায় তাহাদের কণ্ঠ মুখরিত হয়। ক্রমে ক্রমে স্থূল স্বার্থগুলি কি এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের হিল্লোলে ডুবিয়া যায়। প্রার্থনার সঙ্গীতে হৃদয় অভিষিক্ত হইলে, মানস-দর্পণে নিগূঢ় সত্যটাই রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। এইরূপ ভক্তিবিহ্বল হৃদয়-তন্ত্রেই অপৌরুষেয় বেদধ্বনি উঠিয়াছিল। ঋতম্ভরা

প্রজ্ঞার সঙ্কেত এই অবস্থায় স্বভাবতঃই বাহির হয়। শাশ্বত ঋক্‌মন্ত্র এইরূপে বেদমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যুগে যুগে ভারতকে দীক্ষা দিয়াছে। আবার কোথাও নব বেদ রচিয়া উঠিতে পারে, জীবনসমস্যার মীমাংসায় মানুষের উদ্বুদ্ধ প্রাণ নব নব সত্যের আবিষ্কার করিতে পারে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতের বেদকে অতিক্রম করিয়া একটী আদর্শ ও সভ্যতার মন্ত্র কোথাও কেহ উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। ভারতে যাহা নাই, জগতে আজ পর্য্যন্ত তাহা মিলে নাই।

প্রাকৃতিক অত্যাচার হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্বেষণেই মানুষ অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। শস্যহানির আশঙ্কায় বর্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা বরুণ দেবতার কল্পনা ও পূজা প্রবর্ত্তন করিল। আততায়ীর আক্রমণ হইতে নিস্তারপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বজ্রধর ইন্দ্রের সৃষ্টি হইল। ইহা একদিকের কথা। অন্যদিকে, তেমনই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করার প্রচেষ্টায় ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু দেবতাবৃন্দের আবিষ্কার হইয়াছিল। অগ্নিষ্টোমাদি যাগযজ্ঞ কামনাপূর্ত্তির দাবী—শ্রবণ, মনন, ধ্যান, উপাসনাদি গবেষণা ও অনুশীলনের ফল; কর্ম্ম ও জ্ঞান জীবনধারার দুইটীই অনিবার্য্য প্রয়োজন।

জীবনধারণ ও রক্ষণ জীবেরই দাবী। পশু ও মানুষে এই ক্ষেত্রে ভেদ নাই। মানুষ নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে

অনেকের প্রয়োজন যখন এক করিয়া দেখে, তখনই সে পশু হইতে স্বতন্ত্র হয়। তারপর সে যখন অতীন্দ্রিয় জগতের সত্যের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে, তখন সে অসাধারণ, অতিমানুষরূপে আবির্ভূত হয়। ভারতে এইরূপ অতিমানুষের জাতিই গড়িয়া উঠার ধারাবাহিক ক্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কেবলই অতীন্দ্রিয় জগতের সাড়া শুনিতে নিবিষ্ট-চিত্তে বসিয়া থাকিলে জীবন থাকে না। আবার রক্ত-মাংসের দাবীই বহুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিলেও, দুঃখটা ব্যক্তির না হইয়া জাতির ঘাড়েই চাপিয়া বসে। অগ্নিকণার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমান শক্তিযুক্ত। কামনার আগুণ ব্যক্তিকে যেমন পুড়াইয়া ছাই করে, জাতিকেও তেমনি পরিত্রাণ দেয় না। কামার্ত্ত ব্যষ্টি-মনুষ্য শীঘ্র নাকাল হয়, বিপুল জাতির ধ্বংস বিলম্বে ঘটে। ক্ষুদ্র তৃণ এক মুহূর্ত্তে ছাই হয়, বৃহৎ অরণ্য দগ্ধ হয় বিলম্বে। পরিণাম পরিমাণ-ভেদে দ্রুত ও বিলম্বিত হয় মাত্র।

ভারতের জ্ঞান তাই কর্ম্মকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া কাম্য-নিষিদ্ধ-ভেদে যজ্ঞার্থে শ্রেয়ঃ করিয়াছিল, জ্ঞান ও কর্ম্ম অভেদ করিয়া জীবন সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মানুষের মন বস্তুকে সহজে ভেদহীন করিয়া দেখিতে দেয় না। ঋষিযুগেও তাই কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন হইয়াছিল। বৈচিত্র্যের দায়ে বর্ণ ও জাতি পর্য্যন্ত পৃথক্

হইয়াছিল। মানুষ সম্ভবতঃ এমনি করিয়াই উন্নতির পথে আগাইয়া চলে।

কর্ম্ম-ভেদে জাতি-বর্ণ-ভেদ। জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। ধারাবাহিক সন্দর্ভে ইহারই রেখাচিত্র আঁকা হইয়াছে; পরন্তু ভারতের অন্তর্নিহিতপ্রেরণা অখণ্ড ধারায় অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটিয়াছে—তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

মহাভারত গড়ার প্রেরণা, ভারতের আদি-প্রেরণা। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বসাম্রাজ্যগঠনের প্রচেষ্টা বৈবস্বত মনু হইতে সুরু হওয়ার ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায়। জগতে যেখানে যত প্রকার সমাজ ও ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে ভগবান মনুর বিধান প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। নিখিল জগতের আচার ও আদর্শ এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া মনু ব্যতীত আর কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। সার্ব্বজনীন জীবননীতিগঠনের ইহা একখানি মহাগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনুর দিগ্বিজয়-কাহিনী সত্য বলিয়া প্রমাণ করার ইহা ক্ষেত্র নহে। সর্ব্ব জাতির আদর্শ ও স্ব স্ব অভীষ্ট ধর্ম্ম-বিধান মনুই দিয়াছেন। বিশ্বজয়ী মনুর পক্ষে ইহা খুবই সমীচীন হইয়াছিল। আমরা আজ বিভ্রান্তচিত্ত, পরাধীন জাতি, শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়নে অধ্যবসায়হীন লঘুচিত্ত হইয়াছি; তাই "মনুসংহিতার" অন্তর্নিহিত রহস্য

অবধারণ করিতে সমর্থ নহি, অনেক বিরুদ্ধ প্রলাপ উচ্চারণ করি।

বৈবস্বত মনুর পর বিশ্বরাজ্যগঠনের প্রয়াস যে আর হয় নাই তাহা নহে, তবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভারতরাজ্যগঠনের প্রেরণা এই স্বপ্নকে পূর্ণমূর্ত্তি দেয়। তিনি দেখিয়াছিলেন, বিশ্বকে ভারতীয় সভ্যতায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে ব্রহ্মণ্যশক্তির সহিত ক্ষাত্র-শক্তির ঐক্য চাই; ব্রাহ্মণের দিব্যাধিকার তবেই সার্ব্বজনীন করিয়া এক মহাজাতি সৃষ্ট হইতে পারে। এই প্রচেষ্টার ফল্গু-নদী অকস্মাৎ বিপুল উচ্ছ্বাসে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার জন্য মথুরার সিংহাসন আক্রমণ করে; কিন্তু জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ তখন ব্রাহ্মণশাসিত ক্ষাত্রশক্তি; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য তাঁর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এক প্রকার ইহাতে ক্ষান্ত হইয়া উত্তর ভারত পরিত্যাগ করেন—দ্বারকায় রাজ্য-বিস্তার আত্মরক্ষার হেতু হইয়াছিল। পাঞ্চাল-রাজের সহিত পাণ্ডবের ঐক্যসূত্র সম্ভাবিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বকার্য্যসাধনে পুনঃ উদ্বুদ্ধ হন। ইন্দ্রপ্রস্থের সহিত পাঞ্চাল-রাজ্যের সংযুক্তশক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের স্বার্থ-সংঘর্ষ উপলক্ষ—আসলে একদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের নূতন আদর্শ-বাদ, অন্যদিকে ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার সংঘর্ষ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়াছিল। ভীষ্ম কর্ণাদির ন্যায় বীর, দ্রোণ, কৃপ এবং মন্ত্রকুশল বিপ্রগণ প্রায় সবই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের পর ব্যর্থমনোরথ কৃষ্ণচন্দ্রকে উতঙ্ক ঋষির ভৎর্সনা-বাক্য ভারতের ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিদ্রোহীর প্রতি তীব্র কটূক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন ব্যাসদেব। কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভারতে প্রবল জাতিগঠনের মূলে এই মহাপুরুষের সংযোগ ছিল: আর ইনিই ছিলেন সে যুগের প্রচারতন্ত্রের কেন্দ্র-পুরুষ। ইহারই ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক কৃষ্ণস্তুতিতে ভারত মুখরিত হইয়াছিল, পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ প্রচার সম্ভব হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীশক্তির বিরুদ্ধবাদ ঘোষণা করিয়া জাতীয় শক্তিটাকে পাণ্ডব পক্ষে আনার প্রয়াস ও কৌশল ভারতের ইতিহাসে পরিস্ফুট। বিরুদ্ধ পক্ষের ব্রাহ্মণপ্রতিনিধি দুর্ব্বাসা ঋষির কাহিনী ব্যাসদেবের লেখনীকৌশলে তেমন গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না, হাস্যকর প্রহসনের বস্তু হইয়াছে। ভারতের ব্রাহ্মণ-সভ্যতা-রক্ষার সে মহাসংগ্রাম কৌশলে ব্যাসের প্রলেপে আর বাসুদেবপ্রবর্ত্তিত আদর্শবাদের বিরুদ্ধে জিগীষার উদয় করে নাই। ব্যাসদেবের ন্যায় চতুর, লিপিকুশল মনীষী পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মে নাই; তাই তাঁহাকে যুগ-নির্ম্মাণের প্রাজ্ঞ মহাপুরুষ বলা যায়।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণচন্দ্র জয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু গড় আসিলে কি হইবে, সিংহকে হারাইতে হইয়াছিল। সে কাহিনী আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। সে যুগের যবনিকাপাত হইল। ভারতের অমরবীর্য্য বিনষ্ট হইল না। ক্ষত্রকুলেই আবার শাক্যসিংহের অভ্যুদয় এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মূলোচ্ছেদ করার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার তূণ হইতে অজস্রধারায় বাহির হইল। ভারতের ব্রাহ্মণ সে তাল সামলাইয়া আবার মাথা তুলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যে ভাব প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতে ব্রাহ্মণ-জাতি নহে, বিশ্বজয়ী বীর জাতি গড়িয়া উঠে, তাহার দিকেই সে অভ্যুত্থান রোধ করিয়া জাতি-সত্ত্বাকে যুগে যুগে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মণ্য-প্রতিভার শতদল; কিন্তু রামানুজাচার্য্যের ভক্তিবাদে কৃষ্ণচন্দ্র পুনর্জাগ্রত হইয়াছেন; অদ্বৈতবাদের প্লাবনে শ্রীমূর্ত্তি লয় পায় নাই, এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্যশক্তিই জাতি-নির্ম্মাণের সহায় হইয়াছেন। মাধ্ব ও নিম্বার্কের প্রয়াসও জাতিকে এই পথে অধিকতর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিয়াছে। তারপর কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সিদ্ধ করার প্রেরণায় সর্ব্বজাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহাতে বাদ পড়ে নাই। সুফী মতাবলম্বীদের এই মহাজাতির মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্ম-রাজ্য-

সংস্থাপনের সহায়তায় যে জাতি-সৃষ্টির আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে জাতি-বর্ণের বিচার ছিল না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অনার্য্য শ্রেণী হইতেই অধিক শক্তি-সংগ্রহ হইয়াছিল। সেই সকল জাতির রক্তদান বৃথা না হয়, তাহার জন্যই যেন সর্ব্বজাতির মধ্যে ভারতের দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে ধারাবাহিক আয়োজন দেখা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে উহা চরমে উঠিয়াছে। রামানন্দপ্রবর্ত্তিত ভারত-ধর্ম্ম আচণ্ডালের সামগ্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়ায়, ভারতের ধর্ম্মাদর্শ বিপুল জাতি-গঠনের সহায়তা করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে শ্রীবল্লভাচার্য্য, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তির বন্যায় ভারতে নবজাতিগঠনের পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়াছেন। আমরা এই দুই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় দিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শবাদ বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া চারিটী বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলে। রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, মাধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসম্প্রদায়, নিম্বার্কের সনক ও রুদ্রসম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুস্বামী নয়, আচার্য্য বল্লভ ইহাকে প্রীতিমার্গ আখ্যা দিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভের সাধন-পন্থা বাংলার চণ্ডীদাস-কথিত 'পীরিতি'-মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। পীরিতি-নগরেই চণ্ডীদাস জীবকে বসবাস করার সঙ্কেত দিয়াছেন ; পীরিতি

তাঁহার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদেব হইতেই মহারাষ্ট্রে তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি যুগগুরুগণের আবির্ভাব। জ্ঞানদেবের শিষ্য নাথদেব ও ত্রিলোচন। বল্লভাচার্য্য এই ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মবীজ লাভ করিয়া রুদ্র-সম্প্রদায়ের যশোকীর্ত্তি প্রচার করেন।

ত্রৈলিঙ্গ দেশে বল্লভাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষণ ভট্ট। বল্লভাচার্য্য গোকুলে বাস করিতেন, তারপর তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন। এই ইঁতিকথার মূলে কতখানি সত্য আছে, তাহা অবশ্য বিচার্য্য। আমরা সেই সকল জটিল ইতিহাসের অবতারণা করিব না। বিজয়নগর হইতে উজ্জয়িনীতে তাঁহাকে শিপ্রানদীর তটে এক অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইতে দেখা যায়; সেখানে এখনও তাঁহার আসন আছে। এই সকল ঘুরিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাইয়া বালগোপাল-পূজার প্রচার আরম্ভ করেন।

প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সিদ্ধ করার প্রেরণায় সর্ব্বজাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহাতে বাদ পড়ে নাই। সুফী মতাবলম্বীদের এই মহাজাতির মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্ম-রাজ্য-

পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হইবে—ইহাকেই তিনি পুষ্টিমার্গ বলিয়াছেন।

পতির চিত্তবিনোদন করা যেমন সতীর ধর্ম্ম, কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক কোন স্বার্থই যেমন এই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে না, পুষ্টিমার্গীর সাধনে তদ্রূপ আত্ম-পূর্ত্তির কোন কথা নাই, স্বামীর সহিত সর্ব্বাত্মতাতেই পরম তৃপ্তি ও পুরুষার্থ লাভ হয়। দেহাদি নিজের জন্য নহে; ভগবানে সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বভাবে সর্ব্বাত্ম-রূপে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া ভাবময় নিত্য রস আস্বাদ করাই ইহার সাধন। ভাবাশ্রয়ে দেহ ও সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বরস আস্বাদ করে। রাগ-মার্গই আচার্য্য বল্লভের অনুমোদিত।

এই সাধনায় জীব ভগবানকে চায় না, ভগবানই জীবকে চাহেন। জীবের সাধন-হেতু ভগবানের প্রেমাহ্বান; এই আহ্বান যাহার মর্ম্মে স্পর্শ করে, সে এই পথের যাত্রী। ভগবানের চাওয়ার রসেই জীবের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। মর্য্যাদা-ভক্তি বা বৈধী ভক্তি পুষ্টি-মার্গের অনুকূল নয়, প্রেম ও ভক্তি পুষ্টির ঠিক জ্ঞাপকার্থ নয়, আচার্য্য বল্লভ ইহাকে প্রীতিমার্গ আখ্যা দিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভের সাধন-পন্থা বাংলার চণ্ডীদাস-কথিত ‘পীরিতি’-মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। পীরিতি-নগরেই চণ্ডীদাস জীবকে বসবাস করার সঙ্কেত দিয়াছেন; পীরিতি

দেখিয়া পড়সী করিতে, পীরিতি দিয়া ঘর বাঁধিতে বলিয়াছেন। জাতিগঠনেরই ইহা ভিত্তি। আচার্য্য বল্লভ জীবের তিনটী অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—শুদ্ধ জীব, সংসারী জীব ও মুক্ত জীব।

মায়াতীত অবস্থাই শুদ্ধ জীবের লক্ষণ, অবিদ্যাবদ্ধ জীবই সংসারী। আর ভগবানের ভোগেচ্ছায় আনন্দ-রূপে জীবকে মুক্তির অধিকার দিয়া তিনি সদ্‌বাসনাবিশিষ্ট দিব্যজীবন দান করিয়াছেন; তিনি যাঁহাদের তাঁহারাই মুক্ত জীব। গীতায় এই মুক্তকোটী মানুষের জাতিগঠন-যজ্ঞ আরম্ভ করার আহ্বানেই পাঞ্চজন্য কি ফুকারিয়া উঠে নাই?

আচার্য্য বল্লভ ভগবানের মানুষদের ঈশ্বরসেবায় উপবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাওয়া অনাবশ্যক বলিয়াছেন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজনাভাব দেখাইয়াছেন; বরং তিনি যাহা চাহেন তদনুযায়ী বেশভূষায় পরিপাটী হইয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বাত্মভাবে শৃঙ্গাররস-সাধনে তৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু এই মহাভাব মানুষের পঙ্কিল হৃদয়ে যথার্থ ভাবে অবধৃত হয় নাই। ভগবানের বিশুদ্ধ ইচ্ছার অনুগ জীবনই যথার্থ পুষ্টিমার্গের লক্ষণ; কিন্তু সে ইচ্ছা হইতে অপসৃত হইয়া কামনাই এই সম্প্রদায়ের জীবননিয়ন্ত্রণের শক্তি হওয়ায়, উত্তমবসন-ভূষণ-পরিধান, সুখাদ্য অন্ন-

পানাদি ভোগ ও বিষয়সুখে উন্মত্ত গোস্বামিগণ পরবর্ত্তী যুগে আচার্য্য বল্লভের সহজ ধর্ম্ম বিকৃত করিয়াছেন।

ধর্ম্মজীবন গড়ার আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় আমরা আজও ধর্ম্মকে অপার্থিব তুরীয় করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যে জাতিগঠনের মন্ত্র-ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা নীরব হয় নাই, এই সকল তাহারই লক্ষণ। মাধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভের ভক্তি-ঘন মূর্ত্তি অধিকতর স্পষ্ট হইয়া নদীয়ার শ্রীচৈতন্যে লীলায়ত হইয়াছে। বৈষ্ণবজাতি গড়ার বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেম স্বয়ং মূর্ত্ত শ্রীচৈতন্য জাতিগঠনের ভিত্তি-স্বরূপ।

বল্লভাচার্য্যের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্যদেব জন্মগ্রহণ করেন; এই হেতু মণিকাঞ্চনসংযোগ হওয়া কিছু বিচিত্র কথা নহে। শুনা যায়, বল্লভাচার্য্য পূর্ব্বে সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে সংসার গ্রহণ করেন; চৈতন্যদেব সংসারী ছিলেন, পরে অভিনব বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্মে বাংলার গৌরববৃদ্ধি করেন। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকারে অন্তর-বিনিময়ের ফলস্বরূপ দুইজন ভাগবৎ প্রেমিকের রূপান্তর অলৌকিক সাধন-জগতের কোন নিগূঢ় রহস্য যে নহে, তাহা কে বলিবে!

যে বস্তু উপাদান-কারণ সে বস্তু দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র নহে, তাহা বস্তুতন্ত্র হইয়া দেখা দেয়; চৈতন্যদেবে

তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা গিয়াছে। প্রেম-স্বরূপের এরূপ নিখুঁৎ চিত্র কোথাও এমন করিয়া রূপ লয় নাই—তিনি প্রেম-ঘন মূর্ত্তিতে আচণ্ডালকে কোল দিয়া ভারতে দেব-জাতি-গঠনের স্বপ্ন সিদ্ধ করার আকুলতা দেখাইয়াছেন। ভগবানের আহ্বান কেমন করিয়া মানব-কণ্ঠে অমৃত-নিছানি সুরের মুর্চ্ছনা তুলে, তাহা নিমাইয়ের ওষ্ঠপুটের গদগদ-বাণী-রবে প্রকাশ পাইয়াছে—বাঙ্গালী সে প্রেমের আহ্বানে সেদিন উন্মাদ হইয়া জাতি কুল হারাইয়াছিল।

জ্ঞানগরিষ্ঠ অনেক মনীষী এই সকল ভক্তিপ্রবণ অতি-মানুষের আবির্ভাব পরাধীন জাতির দুর্ব্বল চিত্তের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু জ্ঞান-গৌরবের ধ্বজা যখন ইস্‌লামের আক্রমণে ধুলি-ধূসরিত হইল, ইংরাজের প্রচণ্ড শাসন-যন্ত্রে জ্ঞানের বিরাট্ সৌধ চূর্ণ-প্রায় হইল, তখনও এই ভক্তবীর অতি-মানবের দলই প্রবাহের ন্যায় ভারতকে এই হাজার বৎসর ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জ্ঞানে ব্যষ্টি-চৈতন্যই প্রকাশ পায়, ফলে মোক্ষবাদই বড় হইয়া উঠে—জাতি তাই ছন্ন-ছাড়া। গীতায় যে উত্তম ভক্তিবাদের কথা প্রচার হয়, পরবর্ত্তী যুগে নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষ করিয়া, সেই পূত জাহ্নবী-ধারায় ভারত অভিষিক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মকে মাটীর জগতে নামাইয়া ভগবানের রূপ গড়ার আয়োজন করিয়াছে। বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের প্রচেষ্টার মূলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে

যে ভাষা সর্ব্বজীবের দুর্ব্বোধ্য ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত করার কঠোর তপস্যাই দেখা যায়। যে শাস্ত্র, যে তত্ত্ব, যে অমৃত মন্ত্র গুহানিহিত থাকায় ভারতবাসী সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মজীবনলাভের পথ পায় নাই, এই সকল মহাপুরুষ তাহা সর্ব্বজনবিদিত করিয়া ভাগবৎ-জাতি-সৃজনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন ; ভারতের শিক্ষা সভ্যতার আদর্শ জীবনময় করিয়া একটা জাতিসৃজনের আয়াস যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা নিসঙ্কোচেই বলা যায়।

আজ ভারতে যে হিন্দুজাতি নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া আত্মঘাতী হয়, তাহার কারণ—ঈশ্বরপ্রেমে অভিষিক্ত হইয়া আত্মাভিমানরহিত যে অমর জীবনলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। শুষ্ক শাস্ত্র ও বিধি-নিষেধ আঁকড়াইয়া সত্যরক্ষায় একদল অসমর্থ ; অন্য দল অসংযত স্বার্থপর সংস্কারপ্রয়াসে ভারতের তত্ত্বে অবিশ্বাসী হইয়া পরানুকরণে আত্মবিক্রীত ; কিন্তু ভগবানের ডাক অনাহত, সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগী যে তাহার কাণেই সে বাণী ঝঙ্কার দেয়। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শ্রবণ করিয়া যাঁহারা উন্মাদ, প্রেমঘন অমৃতময় জীবন-সংহতিগঠনে তাঁহারা যদি উদ্বুদ্ধ হন, তবেই প্রমাণিত হইবে, হাজার বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নিরর্থক হয় নাই। আমাদের মনে হয়, এই ত্রিশ কোটী হিন্দুর প্রাণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" অতঃপর আবির্ভূত

হইবে, তাহারাই এ দেশ, এ জাতির মেরুদণ্ড হইবে, তাহারাই ভারতে ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের অধিকারী হইবে এবং সে প্রাণ আহরণ করার প্রধান উৎস যে ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা সমুচ্চ কণ্ঠে চিরদিন উচ্চারণ করিব।

*

*　　　*

গুরু নানক ও পরবর্ত্তী গুরুগণ

মহারাষ্ট্রে ধর্ম্মগুরু রামদাসের প্রবর্ত্তিত গৈরিক পতাকা কেন্দ্র করিয়া যে জাতি গড়িয়া উঠে, তাহা ব্যতীত পঞ্চনদে গুরু নানকের ধর্ম্ম-সূত্রে যে শিখজাতির অভ্যুদয়, তাহার কিছু বিবরণ দিয়া বাংলার সাধন-চক্রে জাতি-গঠনের অব্যর্থ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করিব।

ভারতের মায়াবাদ উদ্ভিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মকে মূর্ত্ত করার সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করেন কুরুক্ষেত্রে। তাহার পর হইতে পাঁচ হাজার বৎসর ধর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের সংঘাতে, ভবিষ্য রাজ্যগঠনের এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিয়ত সঙ্গরহিত, অরাগ, অদ্বেষ, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন জীবন কেমন করিয়া সংহতিবদ্ধ হইয়া ভারতে ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিতে পারে, তাহা থরে থরে মূর্ত্ত হইয়াছে। শিবাজী ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে লইয়া গীতার জীবন-নিদর্শন সপ্রমাণ করারই প্রচেষ্টা করিয়াছেন। গীতার সর্ব্বশেষ মাহাত্ম্য-মন্ত্রটীর উল্লেখ এইক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

অর্থাৎ যেখানে ভগবান মূর্ত্তিমান্, ভক্তের আবির্ভাব, সেখানে অচলা কমলা, বিজয় বা সর্ব্বার্থসিদ্ধি, উত্তরোত্তর উন্নতি এবং ধ্রুব জীবননীতির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

আত্মকামনায় বিশ্বজয়ী হইয়াও ভারত অনুভব করিল—ভক্ত ও ভগবানের লীলাক্ষেত্রই এই পৃথিবী; অহঙ্কারের শ্রী ও সম্পদ্ নিত্য হয় না। তাই এই পরমপথে তার যাত্রা স্থুরু হইয়াছিল। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের ন্যায়, যাহা সহজ স্বভাব ও স্ব-ধর্ম্ম তাহা কঠোর দুঃসাধ্য ও অধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হওয়ার মোহও সঙ্গে সঙ্গে জুটিতে থাকে; কেন না, বিপরীত বুদ্ধির সংঘর্ষেই ভাগবতবুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়। বন্ধন ও মোক্ষের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্যের, ভয় ও অভয়ের সংঘাতে মুরারীর তৃতীয় পথের সন্ধানে এই পাঁচ হাজার বৎসর ভারতের গতি অব্যর্থ সঙ্কেতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের মধ্যাহ্ন-ভাস্কর তখন ভারতের গগনে সমুদিত। বহুলোল লোডির রাজত্বকাল চলিয়াছে। গুরুর পিতা কুণ্ডু জাতিতে ছেত্রী ছিলেন—ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

গুরু নানক কৈশোর বয়সেই ধর্ম্মপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। তিনি অদ্বৈত ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, জাতি বর্ণ স্বীকার করিতেন না। দীর্ঘ-জীবন প্রচার-কার্য্য করিয়া ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই জন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন, বুধ ও লেনা। গুরুর প্রতি অনন্য-বিশ্বাসের অধিকারী নির্ণয় করার জন্য তিনি উভয়কে কঠোর অগ্নিপরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। লেনা তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেন। এক শবদেহ ভক্ষণ করার আদেশ বুধ উপহাস মনে করিয়া উপেক্ষা করেন; লেনা গুরুর আদেশ পালন করিয়া গুরুপদে অভিষিক্ত হয়। ইনিই অঙ্গদ নামে প্রসিদ্ধ এবং গুরুমুখী ভাষার প্রবর্ত্তক।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের দেহাবসান হয়। অমরদাস তৃতীয় গুরুর আসন অধিকার করেন। গুরু অমরদাসের প্রচেষ্টায় শিখধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। অমরদাসকে কেন্দ্র করিয়া শিখধর্ম্ম এক বিপুল সম্প্রদায়-রূপে গড়িয়া উঠে। তিনি সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিখ পৃথক্ করিয়া দেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর হয়।

গুরু অমরদাসের পর চতুর্থ গুরু রামদাস। শিখধর্ম্মে বহু ধনবান্ ব্যক্তি এই সময়ে দীক্ষালাভ করিয়া শিখ-সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করিয়া তুলে। অতঃপর রামদাসের তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন গুরুপদ প্রাপ্ত হন। ইহা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের

কথা। এই সময়ে মোগলসম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্ব ধর্ম্ম সমচক্ষে দেখার সুযোগ লইয়া গুরু অর্জ্জুন শিখ-সম্প্রদায়কে সুগঠিত জাতি-সঙ্ঘে পরিণত করেন। এতদিন পর্য্যন্ত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রভাবই শিখ-সম্প্রদায়কে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিল, গুরু অর্জ্জুন ঐশ্বর্য্যবল সংযুক্ত করিয়া ইহা লোক-চক্ষুর সম্মুখে নূতন ভাবে স্থাপন করিলেন। শিখ-ধর্ম্মীর এ পর্য্যন্ত কোন মন্দির ছিল না; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, জীবে দয়া, ভগবানের আরাধনা হৃদয়ের সহিত করার উপদেশই নানক দিয়াছিলেন। গুরু অর্জ্জুন অমৃত-সহরে শিখধর্ম্মের গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া শিখজাতির কেন্দ্রতীর্থ গড়িয়া তুলিলেন এবং শিখের জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য লিখিত শাসন-বাক্য প্রবর্ত্তন করিলেন। শিখদের শাস্ত্রগ্রন্থ "গুরুগ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক শিখের নিকট হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নিয়মিত অর্থ আদায় করার ব্যবস্থা করেন, এবং এই অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাইয়া ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত শিখজাতির কীর্ত্তি প্রচার করায় কৃতকার্য্য হন।

ইহাতেই রাজশক্তির ও অনেক স্বদেশবাসীর তিনি চক্ষুশূল হইলেন। অনেকে বলেন—গুরু অর্জ্জুন শিখধর্ম্মের বিপদই আনিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; শিখের অমরবীর্য্য গুরু অর্জ্জুনের আন্তরিকতায় মুক্তি

লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মের ভিত্তিতে জীবন গড়ার যে অধ্যাত্মশক্তি, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অনুকুল রূপে দেখা দেয় নাই; নানারূপ চক্রান্তে তিনি জাহাঙ্গীরের রোষবজ্রে দগ্ধপ্রায় হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারা মৃতদেহ লাহোরের স্বর্ণমন্দিরে সমাধিস্থ করা হয়। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ইহা হইতেই শিখ জাতির হিয়ায় রাজ্য-গঠনের অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ। পিতার অপমৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে শত্রুনিধনের ভীমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি শিখ জাতিকে সমর-নিপুণ জাতি-রূপে গড়িয়া তুলিলেন। তিনি দুইখানি তরবারি সঙ্গে রাখিতেন। একখানি প্রতিবিধিৎসা-সাধনের জন্য এবং অন্যখানি মুসলমানশক্তির উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইত। শিখের রণোন্মত্ততা ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দের নেতৃত্বে স্বাভাবিক হইয়াছিল। সাজাহান তখন দিল্লীর সিংহাসনে; শিখজাতির উচ্ছেদ-কামনায় তিনি এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু সুদক্ষ শিখজাতির রণকৌশলে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

প্রবল মোগলশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ নহে, গুরু হরগোবিন্দ ইহা বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি আত্মগোপন করিলেন। শিখজাতিকে তিনি গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ

করিয়া তুলিলেন। মোগলশক্তি তাহার সন্ধান পাইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এইরূপে তুইবার তিনবার তিনি মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ইহার পর রণক্লান্ত শিখ-গুরু বিতস্তা নদীর উপকূলে রাহেলা নামক স্থানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া নির্জ্জন হিরাতপুর নামক স্থানে তিনি শেষ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল—গুরুদিৎ, তেগবাহাদুর, সুরৎসিং, আলরৎ ও উত্তুলরাও। গুরুদিৎ অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, তদীয় পুত্র হর-রাও সপ্তম গুরুপদ প্রাপ্ত হন। শিখের গৌরবরক্ষায় তিনি সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম ছিলেন। শিখজাতির এই সময় অধঃপতনের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোগল-রাজ-পরিবারেও এই সময়ে আগুন ধরিয়াছে। সাজাহান কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। হর-রাও দারার পক্ষ লইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী আরঙ্গজেবকে বরণ করিয়া লইলে, হর-রাওয়ের বিপদ্ হইল। তিনি মোগলসম্রাটের রোষ-বজ্রের সম্মুখে নিজেকে পতঙ্গবৎ মনে করিয়া স্বীয় পুত্র রামরাওকে শিখজাতির প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। শিখের কীর্ত্তি মসীলিপ্ত হইল, শিখসমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল; কিন্তু হর-রাও ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলেন।

হর-রাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হর-কিষণ নিজেকে গুরু বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দারুণ বসন্তরোগে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যু-শয্যায় তাঁহাকে গুরু নির্ব্বাচন করিতে বলিলে, তিনি সঙ্কেতে তেগবাহাদুরকে গুরুপদে বরণ করার উপদেশ দেন। ইহাতে রাম-রাও ক্রুদ্ধ হইয়া আরঙ্গজেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তেগ-বাহাদুরকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইল। গুরুগোবিন্দ তেগবাহাদুরের পুত্র, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। পিতা পুত্রকে শিখের তরবারি দিয়া বলিলেন—"বৎস, বিপদ্ সম্মুখে। যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, শৃগাল কুক্কুরে আমার মৃতদেহ যেন ভক্ষণ না করে। শিখের ভাগবত বিশ্বাস তোমায় সর্ব্বজয়ী করুক।" তেগের এই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল।

রাম-রাও তেগকে নিকটে পাইয়া গুরুপদ ত্যাগ করিতে বলিল। তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বিনা বিচারেই তেগ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যথাসময়ে সম্রাটের সম্মুখে নীত হইলে তাঁহাকে শিখধর্ম্ম ছাড়িবার আদেশ করা হইল, নির্ভীক শিখগুরু তেগবাহাদুর ইহাতে সম্মত হইলেন না। আরঙ্গজেব বলিলেন—"ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে না পারিলে তোমার শিরচ্ছেদ করিব।" ঈশ্বর-বিশ্বাসী তেগ এক খণ্ড কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিলেন, তারপর অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

"আমার বক্তব্য ইহাতে রহিল ; দেখিও, ঘাতকের অসি যেন ইহা স্পর্শ না করে।" তারপর অসি ঝলসিল, তেগ ছিন্নমুণ্ড হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। দিল্লীর রাজসভা শিখগুরুর লিখিত বিষয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। আরঙ্গজেব সবিস্ময়ে কণ্ঠলগ্ন পত্রখণ্ড খুলিয়া বিষণ্ণচিত্তে পড়িলেন, অগ্নিময় অক্ষরে লেখা—"শির দিয়া, সার নাহি দিয়া।"

আরঙ্গজেব নিশ্চয় করিলেন—এ জাতি নিশ্চিহ্ন না হইলে, তাঁহার রাজ্য নিরাপদ্ নহে। তিনি ধারাবাহিক ভাবে শিখজাতির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবক গোবিন্দ সিংহ শক্তিসঞ্চয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। শিখ-জাতির ভিতর উপর্য্যুপরি অত্যাচারে আগুন জ্বলিয়াছিল—গুরুগোবিন্দ তাহা ফুৎকারে প্রলয়সৃষ্টির অনুকূল করিয়া তুলিলেন, বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রে শিখধর্ম্মে নবপ্রাণ সঞ্চার করিলেন, রক্ত-তিলক ললাটে আঁকিয়া পঞ্চশিখের প্রতিষ্ঠা হইল। মৃত্যুপণে গুরুর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া লাহোরনিবাসী ক্ষত্রিয় দয়াসিং, হস্তিনাপুরনিবাসী জাঠ ধর্ম্মসিং, বিদর্ভপুরনিবাসী নাপিত সাহেব সিং, দ্বারকা-নিবাসী ছাপা মহকম সিং এবং উড়িষ্যা-নিবাসী কাহার হিম্মত সিং বীরদর্পে শিখের বিশ্বাস বুকে লইয়া গুরুকে বেষ্টন করিলেন। শ্রীগুরু নানক যেমন লেনাকে পরীক্ষা করিয়া শিখবীর্য্য-রক্ষায় অধিকারী বলিয়া সান্ত্বনা

পাইয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তেমনি এই পাঁচ জনকে বক্ষে ধারণ করিয়া ইঁহাদের বলিলেন—"খাল্‌সা গুরুসে আউর গুরু খালসাসে হোই এক, দুস্‌রে কো তাঁবিদার হোই।" তারপর লৌহপাত্রে জল রাখিয়া, তাহাতে তরবারি ডুবাইয়া উহা অমৃত-স্বরূপ তাহাদের পান করিতে দিলেন।

এই ঘটনার পর শিখদের মধ্যে বিশ্বাসের প্রচণ্ড শক্তি জাগিয়া উঠিল। কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইল—

"সওয়া লাখ্ পর এক চড়াউ
যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ।"

গোবিন্দের দীক্ষায় একজন শিখ সওয়া লক্ষ সংখ্যক শত্রু নিধন করিবে। এই অমরমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বিশ হাজার শিখ গুরুজীর জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিল। ধর্ম্মের ভিত্তিতে শিখজাতিকে তিনি সংহতিবদ্ধ করিলেন। বেশ্যাগমন শিখের নিষিদ্ধ হইল। দ্যূতক্রীড়ায় শিখ সময়-ক্ষয় করিবে না, গ্রন্থপাঠ নিত্য করিবে। নানক-কৃত জপজী, গোবিন্দ-কৃত জপজী, আনন্দজী, রহরস, আরতি ও কীর্ত্তন নিত্য পাঠ্য হইবে। শিখ কামক্রোধাদি রিপুর বশ হইবে না, কুকর্ম্ম করিবে না, জবাই-করা মাংস খাইবে না, যবনের হাতে মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না। সে কেশ রক্ষা করিবে, কৃপাণ ও টাঙ্গা ধারণ করিবে, কচ্ছ পরিধান করিবে, কড়া হস্তে রাখিবে। গুরুভ্রাতাদের সহিত সে প্রীতি রাখিবে,

গুরুনিন্দককে ক্ষমা করিবে না, গ্রন্থকে গুরুর স্বরূপ-বোধে শ্রদ্ধা করিবে। সে শাস্ত্রাভ্যাস রাখিবে, তুর্ককে বিশ্বাস করিবে না, অর্দ্ধেক নামে শিখকে সম্বোধন করিবে না। মন হইতে সে দুঃখ দূর করিবে, ইহলোক ও পরলোক সবই বাঁহুবলের উপর নির্ভর করিবে, আদর্শ ও মন উচ্চ হইবে; কিন্তু সে নম্রতা ত্যাগ করিবে না, কবরাদির পূজা নহে, তরবারিই পূজ্য স্মরণ রাখিবে।

ধর্ম্ম-প্রাণ শিখ জাতি এই জীবন-নীতির সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। গুরু-গোবিন্দ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ গুরুমুখীতে অনুবাদ করিয়া তিনি শিষ্যদের মধ্যে আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বারাণসী হইতে ব্রাহ্মণ কেশবদাসকে আনাইয়া তিনি চণ্ডিকা নয়না দেবীর মন্দিরে হোম-জপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, দিব্য-শক্তির সহায়তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। দশম গুরু-গোবিন্দ ধর্ম্ম-জীবনের উপর এক মহাজাতিসৃষ্টির স্বপ্ন সার্থক করার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, শিখ জাতির এই অমর-বীর্য্য তাই আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

গুরুগোবিন্দ প্রত্যেক শিখ পরিবার হইতে প্রতি চারি জনের মধ্যে দুই জনকে সামরিক বিদ্যায় নিপুণ করিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি সমর-নিপুণ ৮০ হাজার শিখসৈন্যবাহিনী গড়ায় সফলকাম হইয়াছিলেন; এইবার

মোগলশক্তির সহিত তাহার সংঘর্ষ বাঁধিল। সৈয়দ খাঁ নামক এক ব্যক্তির সেনাপতিত্বে মোগলসম্রাট্ এক বিশাল বাহিনী গুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন ; কিন্তু দৈবশক্তি-বলে এই ব্যক্তি শিখদের দলভুক্ত হইয়া যায়। বাদশাহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরখাঁকে গোবিন্দসিংহের আনন্দপুর অবরোধ করিতে আদেশ করেন। অবরোধ-কার্য্য আরম্ভ হইল—একদিকে প্রবল মোগল শক্তি, অন্য দিকে শিখ জাতির ক্ষুদ্র সংহতি। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন, যাত্রাকালে তদীয় জননী ও সন্তানদ্বয়কে সরহিন্দ সহরে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ঐ ব্যক্তি মোগলের হস্তে ইঁহাদের সমর্পণ করিল। গোবিন্দের পুত্রদ্বয় ধর্ম্মান্তরগ্রহণের আদেশ অমান্য করিলে, তাহাদের জীবন্তে সমাধি দেওয়া হয়। বীর পিতার পুত্রদ্বয় পিতামহের ন্যায় ভিত্তিগাত্রে ইষ্টকের পর ইষ্টকের অন্তরালে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন— শিখের বিশ্বাস উচ্চ শিখায় গগন চুম্বন করিল।

কিন্তু মোগলের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে গুরু-গোবিন্দ মাথা তুলিতে পারিলেন না। সসৈন্যে ক্রমেই দেশ হইতে দেশান্তরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আত্মস্থ হইয়া শিখ জাতির অটল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। বাহাদুর শা শিখ-গুরুর সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ-

দমনের জন্য বাহাদুর শা পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া শিখ-গুরুকে সেনাপতি-পদে বরণ করেন, কিন্তু নান্দোর গ্রামে তিনি এক পাঠান দস্যুর হস্তে গুরুতর রূপে আঘাত-প্রাপ্ত হন।

তাঁর জীবিতকালে প্রবল শিখের সম্মুখে মোগলের অত্যাচার মাথা নত করিয়াছিল। সধৌরা, সরহিন্দ প্রভৃতি স্থানে মোগলদের উপর তিনি চিরদিন খড়্গহস্ত ছিলেন। মোগল অধিবাসীরা সম্রাটের নিকট ইহার প্রতিকারপ্রার্থী হইলে, তিনি উহাদিগকে গোবিন্দ সিংহের নিকটই পাঠাইয়া দিতেন।

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর পবিত্র চিতানল ঘিরিয়া সহস্র সহস্র শিখের কণ্ঠে বজ্র-নিনাদ উঠিয়াছিল—"ওয়া গুরুজীকী ফতে"। শিখ জাতির রক্তে আজও ঈশ্বর-বিশ্বাসের অগ্নিস্রোতঃ বহিতেছে। আজও বীরত্বে শিখ অদ্বিতীয়। শিখের জাতীয়তা গৌরবস্মৃতি-রূপে তাহাদের বুকে আঁকিয়া আছে। জাতিগঠনের সজীব ইতিহাস শিখের জীবনে আজিও দেদীপ্যমান; কিন্তু আজ স্বাধীনতার ধ্বজা ক্ষুদ্র পাঠান মোগলের বাধায় অনুন্নত নহে, পৃথিবীর শক্তি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে, শিখেরও একটা নবজন্ম চাই।

* * *



রামকৃষ্ণ

বাংলায় যুগ-সাধনা

বাংলায় এই নবজীবনেরই যাত্রা সুরু হইয়াছে। শিখের ধর্ম্মজীবন প্রতিবিধিৎসার তাড়নায় অতি শীঘ্র রক্তপিপাসায় বজ্র-কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সে নিষ্ঠুর মূর্ত্তি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ভিত্তি চূর্ণ করিয়া আপনাকেও একপ্রকার বিসর্জ্জন দিয়াছিল। বাংলায় জাতিগঠন-যজ্ঞ বিশুদ্ধ, নিরতিশয় ও অপক্ষয়শূন্য—ভাগবত প্রেরণায় নিঃশব্দে অবাধে সম্পন্ন হইতেছে; ইহা প্রতিক্রিয়া বশতঃ ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। ইহা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কয়েকটী কথায় ইহারই দিক্‌নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

বাংলায় যে জাতিগঠনের প্রেরণা তাহা বাহ্য বাধায় নিরস্ত হওয়ার অবস্থায় আসে না, দৃষ্টি এখানে অন্তরের দিকে। গঠন-যজ্ঞের ঋষি আহুতির পর আহুতি দিয়া যজ্ঞানল অনির্ব্বাণ রাখিয়াছে, অন্তরের বাধা সরাইতে সরাইতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। যেদিন সে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবে, ভূমার অধিকারী হইবে, ইন্দ্রজালের ন্যায় বাহিরের বন্ধন তাহার স্বতঃই খসিয়া পড়িবে।

ইহা হিঁয়ালী বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাংলার সাধনপ্রবাহ নির্দ্বন্দ্বে অমোঘ লক্ষ্যে এই ভাবেই ছুটিয়াছে।

শিখের ধর্ম্মবিশ্বাস জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় স্থূলতঃ ভীষণ, ছড়াইতে ছড়াইতে চতুর্দ্দিকে ভীমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ধর্ম্মসাধনের কেন্দ্র শিখজাতি মানুষের মধ্যেই সন্দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থূল গুরুমূর্ত্তি—একটা সীমার মাঝেই এই মহাশক্তির অভ্যুত্থান ও অবসান তাই লক্ষ্যে পড়ে।

বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস কোটীচন্দ্রদ্যুতিময়, জগৎকে ইহা স্নাত ও অভিষিক্ত করিয়া শান্তি ও আলোর রাজ্যে টানিয়া আনে; আর সাধনার কেন্দ্র মানুষ হইলেও, বাঙ্গালী এই মানুষকে দেখিয়াছিল অপৌরুষেয় বস্তু-রূপে, স্থূল রক্ত-মাংসের শরীর হইলেও তাহার মধ্যে চিন্ময় দেহের আভাস পাইয়াছিল। বাঙ্গালী মানুষকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল মানুষ হিসাবে নয়, পুরুষোত্তমের আসনে—এই উত্তম রহস্য মরমী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না।

গীতার মন্ত্র বাঙ্গালীই অনুবাদ করিতে চাহিয়াছে। নববৃন্দাবন-রচনায় বাঙ্গালীর প্রাণই জাগিয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতির শাসন বাক্যতঃ অস্বীকার করিলেও, সে তত্ত্বতঃ উহার মর্য্যাদা রাখিয়াছে। গীতার "মানুষীংতনুমাশ্রিতম্" ভগবানকে চিনাইয়া দিবার অভিনব মূর্চ্ছনায় সঙ্গীতের

ঝরণা ঝরে সর্ব্বপ্রথমে চণ্ডীদাসের কণ্ঠে ; সে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি আজও শুনা যায়—"শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।"

মানুষের ভিত্তি এমন সুদৃঢ় করার উদাত্ত মন্ত্র আর কোথাও এমন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে কি না, জানি না। সেই মানুষের ধর্ম্মের বর্ণনার ছলে যে বিবরণ মিলে, তাহা দিব্য, অসাধারণ, অপ্রাকৃত জীবনেরই পরিচয়। ইহা দিব্য মানুষেই সম্ভব, আর সেই মানুষকে ঘিরিয়া জাতি-কুল-হারা একদল অন্বেষীর ভীড়ই বাড়িতে দেখি—ঈশ্বরবিশ্বাসের আগুন এখানে অনির্ব্বাণ রাখিয়াই মানুষের সংহতিসৃজনের প্রবাহ পরিষ্কাররূপেই ব্যক্ত হয়। তারপর, জাতিগঠনের মূর্ত্তিমান্ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের গীতি-ধারায় জাতীয় ভিত্তি অগ্নিশুদ্ধ হইয়াছে। "ব্যাভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী"—বলিয়া প্রকৃতিশুদ্ধির সঙ্কেত চণ্ডীদাসের কণ্ঠে বাজিয়াছে। নিমাইয়ের জীবন ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। নবদ্বীপচন্দ্র বাঙ্গালীর জীবন ধন্য করিয়াছেন। মন্ত্র আর ভাব নয়, ভাষা নয়—

"কাম আদি ষড় রিপু বৈষ্ণবশরীরে।
ভ্রমেতে কখন নাহি রহিবারে পারে॥"

একটা জাতি এইরূপে বিশুদ্ধ চরিত্র যদি লাভ করে, ভাগবত প্রকাশ অমোঘ ভাবে সিদ্ধ হয়।

ধর্ম্মরাজ্যগঠনের চরিত্র-চিত্র গীতায় ছিল, সে আলেখ্য বাংলার বৈষ্ণব সাধনার রঙে রেখায় আঁকিয়া উঠিয়াছে।

শিখ জাতি আসন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধি লক্ষ্যে রাখিয়া জীবন-নীতির প্রবর্ত্তন করে। যে শিখ তাহা পালন করে না, তাহাকে শিখ বলিয়া গণনা করা হয় না। বৈষ্ণবজাতি-গঠনেও জীবন-নীতির সুব্যবস্থা হইয়াছিল। আশু প্রয়োজনসিদ্ধির উত্তেজনায় মানুষে কর্ম্ম-প্রেরণা অতি শীঘ্র প্রবুদ্ধ হয়; এই ক্ষেত্রে তাহার অভাব আছে। এইজন্য ইহা আজিও উপেক্ষিত। সম্মুখের বাধা উল্লঙ্ঘন করিলেই আমরা নিরাপদ্ হই না, বাধার মূল কারণের নিরসনে মুক্তিলাভ হয়। বাংলার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ইহা বুঝিতেন, বাধার মূলে তাই কুঠারাঘাত করার বিধান দিয়াছিলেন। যদি জ্ঞানতঃ অধ্যবসায় সহকারে তাহা পালন করার সংহতি গড়িয়া উঠিত, তাহা দুর্জ্জয় মূর্ত্তিতে আজিকার সকল সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইত; কিন্তু ব্যষ্টির পরিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত সাধনায় সমষ্টিগঠনের অবসর এ পর্য্যন্ত বাংলার হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বপ্রবর্ত্তকগণের কয়েকটী বিধান মূলতঃ ঠিক রাখিয়া বর্ত্তমানের অনুকূল ভাষায় সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

গীতার নবজন্ম লাভের সঙ্কেত দিতে গিয়া, পুনর্জ্জন্মের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভগবানে উন্নীত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।"

ভগবানে জন্মলাভ অর্থে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের অধিকার পাওয়া। সে কর্ম্ম—সাধুজনের রক্ষা, দুষ্কৃতি-দমন ও ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপন। এই লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে একটা ধর্ম্মপ্রাণ জাতিরই অভ্যুত্থান প্রয়োজন, এ কথা বলাই বাহুল্য। ভারতে ইহারই প্রচেষ্টার কথা সাধ্যমত এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি।

ভাব হইতে বস্তুতন্ত্র জীবন গঠন করার মন্ত্র গীতায় আছে; তাহা মূর্ত্ত করার জন্যই অপ্রাকৃত জীবন-নীতির প্রবর্ত্তন। গীতার "মানুষীংতনুমাশ্রিতম্" ভাগবত পুরুষের সন্ধান এই নীতির প্রথম কথা; ইহাকে ইষ্ট-নিরূপণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইষ্ট বলিয়া যাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত, তাহাতেই তনুমনোপ্রাণে আশ্রিত হওয়া দ্বিতীয় কথা। অতি কৌশলে ইষ্টসেবার সাধন-পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়—তারপর এই দিব্য পথে অভিসার। অভিনব, অপ্রাকৃত পথে চলিতে হইলে ভজনের রীতি জানিতে হয়; এই রীতিই সাধককে পুরাতন ক্ষেত্র হইতে উপরে তুলিয়া

ধরে, ভোগ ও আসক্তি দূর করে। এইরূপ নিঃসঙ্গ যোগীই তীর্থস্বরূপ গুরুধামে বাসের অধিকারী।

জীবনের নূতন আচার ও স্বভাব সূর্য্যোদয়ে পৃথিবী আলোকিত হওয়ার ন্যায় বাহিরে প্রচারিত হয়। অন্ধকারের সহিত আলোকের যুদ্ধ বড় সূক্ষ্ম, মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। যাহা অভাগবত, তাহার সহিত এই ভাগবত জীবনের সংঘর্ষ খুবই স্বাভাবিক—তখন স্বভাব ও স্বধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রাপ্ত, তাহার রক্ষাহেতু সমষ্টি-শক্তির দিকে লক্ষ্য পড়ে, স্বজাতি বলিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়, যাহারা একই ইষ্টকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হয়। ইহাই দিব্য সঙ্ঘ।

বিদ্বেষ ও বিবাদ এই ক্ষেত্রের গুণ ও ধর্ম্ম নহে। বাহিরের সংঘাতে প্রচণ্ড উত্তেজনাও এইখানে দেখা যায় না —আঘাতে আঘাতে অধিকতর আত্মস্থ হওয়ার ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। বিরোধীর প্রতি ঔদাসীন্যে প্রতিক্রিয়ার অবকাশ না থাকায় মণ্ডলীগঠনে বিশেষ বাধা ঘটে না, সমষ্টিচক্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ার আশঙ্কাও থাকে না। আবার আপনাদের মধ্যেও ভাব-বিপ্লবে এইরূপ মণ্ডলী বিপর্য্যস্ত হয় না; যাহা আত্মধর্ম্ম নহে, তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, এমন কি শাস্ত্রবাক্যও যদি ইহার বিপরীত বোধ হয়, তাহাও এইক্ষেত্রে পরিত্যজ্য হয়। কার্পণ্য-ত্যাগ, রিপু-দমন, উদ্বেগশূন্যতা প্রভৃতি দিব্যজনের অধিকারী

এইরূপ মণ্ডলীর নরনারী জাতি-গঠনের উপাদেয় জীবন-নীতি পালন করিয়া চলে। বৈষ্ণবধর্ম্মে এইরূপ অসংখ্য প্রকার আত্মগঠন ও জাতি-গঠনমূলক নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে থাকে। কিন্তু তাহা আমরা পালন করি নাই, সর্ব্বক্ষেত্রে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভাবুকতার প্লাবনে ধর্ম্ম আমাদের ভাসিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম সাধনা অভিনয়ের মত আমাদের সঙ্ সাজাইয়াছে, ইহার অমোঘ বীর্য্যে আমরা সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠি নাই।

ইষ্টজ্ঞান হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি বা শাস্ত্র বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতি হয়, ইহাই বেদস্বরূপ। বেদ-প্রতিষ্ঠ এই মহাজাতির মর্য্যাদাবোধই জাতীয়তা এবং ইহা হইতেই স্ব-রাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্যের গঠন হইতে পারে। এই পথে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় চলিতে সুরু করিয়াছিলেন।

ইহাতে সফলকাম না হওয়ার হেতু আর অন্য কিছু নয়, মানব-সংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তির অভাব। অহঙ্কার ও কামনা এই পথের মহাশত্রু। অহঙ্কার ও বাসনা প্রকৃতি হইতে উপজাত; এই প্রকৃতির যদি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম ভাগবত জীবন অসম্ভব হয় না।

ভারতের সাধনায় আমরা 'অহং'-ত্যাগের সাধনায় জীবের মধ্যে যে পৌরুষ, যে প্রচেষ্টা, উৎসাহ, তাহাই দমন করায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারতে নারীর অপেক্ষা

পুরুষকেই সাধন-ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর হইতে দেখা যায়। আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চেষ্ট করার সাধনায় মায়াবাদ আশ্রয় পাইয়াছে। মায়াকে অতিক্রম করিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধির চেতনা অন্ধকারে ডুব দিয়া ভাবিয়াছে—নিষ্কৃতি পাইলাম, কিন্তু আসলে ইহাতে অহঙ্কার দূর হয় নাই।

এই জন্যই কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া উঠে। অহঙ্কারত্যাগের উপায়স্বরূপ আত্মসমর্পণ-যোগ প্রচার হয়। তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য ঘনীভূত মানবশরীরে নামাইয়া আনা হয়। পরবর্ত্তী যুগে দ্বৈতাদ্বৈত বাদ লইয়া দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

আপনাকে লক্ষ্যে রাখিয়া সাধনায় ডুব দিতে চাহিলে আত্মভাবের লয় স্বাভাবিক। যেখানে ইহার লয় হয় নাই, সেখানে অশুদ্ধির একান্ত ক্ষয়াভাব-প্রযুক্ত দুর্দ্দান্ত অহঙ্কারই মাথা তুলিয়াছে। এইজন্য দেখি, ধর্ম্মগুরুগণের অন্তর্দ্ধানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মসেবী নারী-পুরুষের মধ্যে নিষ্পরোয়া ব্যাভিচারই প্রশ্রয় পাইয়াছে।

বাঙ্গালী লয় চাহে নাই, জীবন চাহিয়াছে। অশুদ্ধি-ক্ষয়ের পথে তাহাকে তাই প্রকৃতি হওয়ার তপস্যায় উদ্যোগী দেখা যায়। কৃষ্ণচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব সাধনায় প্রক্ষিপ্ত অশুদ্ধ পৌরুষ অনর্থ বাধাইয়াছে ; ইহা সন্দর্শন করিয়া বাংলার সাধনায় কৃষ্ণচন্দ্রের স্থলে

শ্রীরাধাকে ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধনা বড় বৈচিত্র্যময় ও অপূর্ব্ব রহস্যজনক। "পুরুষ হিজ্‌রা, নারী খোজা"—এই বোধই রক্তমাংসের সংস্কারলোপের পক্ষে হিতকর বোধ হইয়াছিল। কামগন্ধহীন নিকষিত-হেম প্রেমের সাধনায় কিন্তু স্নিগ্ধ জীবন গড়ে নাই, এখানেও ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে—তাই আমরা দেখি, ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গকে—প্রেমের সে নিঃসঙ্গ উলঙ্গ সত্য বাঙ্গালীর ধারণসামর্থ্যে কুলায় নাই—চৈতন্য-যুগের পর সাধনক্ষেত্রে প্রেমের লীলাই চক্ষে পড়ে।

ইষ্টের রূপ ও ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল হালিসহরে। মাতৃ-যজ্ঞের আগুনে আঁশুদ্ধি-তর্পণের ইহা মহাযজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'কাঁচা আমি' মাতৃপ্রেমানুরাগে দ্রবীভূত হওয়ার আশায় বাংলায় নব তান্ত্রিকের আবির্ভাব। হালিসহরে রামপ্রসাদের কণ্ঠ বাণীময় ছিল; দক্ষিণেশ্বরে তাহা মূর্ত্তি লইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিল। বৈষ্ণবসাধনায় 'নারীর মিশালে নারী' হইতে গিয়া প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারই ভোগপুষ্ট হইয়াছিল—মাতৃক্রোড়ে বসিয়া সে দায় ঘুচিল। জাতি-গঠনে যে বিরাট্ আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল, তাহা রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

হালিসহরের ব্রহ্মময়ী কালীই রাজা রামমোহনের

মানস-পটে ব্রহ্মস্বরূপ ফুটিয়া উঠেন। তিনিই জাতি-গঠনের নূতন উপাদান সংযোগ করেন। কিন্তু মাতৃমন্ত্র-সিদ্ধ জাতি মাথা না তুলিলে পুরুষোত্তমের অনুভূতি সম্ভব নয়; তাই দেখি, কাঁটালপাড়ার ঋষির কণ্ঠে যে মহামন্ত্র "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে আসমুদ্র হিমাচল তাহাতে মুখরিয়া উঠে।

মাতৃ-সাধনার যুগ আজও শেষ হয় নাই। সন্তান-ব্রতীর সমষ্টি গড়িয়া না উঠিলে, বাঙ্গালী দুর্জ্জয় হইবে না। বাংলার সাধনচক্রে তাই আজ দশপ্রহরণধারিণী মহাশক্তি উমারাণী আসন বিছাইয়া বসিয়াছেন। রাজরাজেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর আসন ঘিরিয়া একদল নারী পুরুষের সিদ্ধ জীবন-বেদীর উপরই ভারতের ধর্ম্মরাজ্য গড়িয়া উঠিবে।

হৃদয়গ্রন্থী উদ্ভিন্ন করিয়া বাঙ্গালী নিঃসংশয় হইয়াছে, প্রাণবলির চেয়ে ভক্ত্যর্ঘ্যের মূল্য বুঝিয়াছে। ধর্ম্মজীবনের মূলে বিশ্বাস ও ভক্তির উৎস আজ যদি উৎসৃত হয়, তবেই যুগ-গুরুগণের সঙ্কেত আমরা অবধারণ করিতে পারিব। বাঙ্গালীকেই এই পথে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।